# পাঠ-সংকলন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ -পক্ষে

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ -কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫১
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৫৪
তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৮
পুনর্মুদ্রণ : ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২
ডিসেম্বর ১৯৬২ : ১৮৮৪ শক

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী। ৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

৪০·১

# সূচীপত্র



## পদ্যাংশ

## গদ্যাংশ

# কবিগুরু-বন্দনা

## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে।
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর। শ্রীভর্তৃহরি ; স্থরি ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুরভাষী ;
মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার।— হে পিতঃ, কেমনে
কবিতারসের সরে রাজহংসকুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
( দীন আমি ) রত্নরাজি, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, করো অকিঞ্চনে।

# কাশীরাম দাস

## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চন্দ্রচূড়জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃতহ্রদে রাখিলা তেমতি—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী
( সুধন্য তাপস ভবে, নরকুলধন ! )
সগরবংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে এ তিন ভুবন,
সেইরূপে ভাষাপথ খননি স্ববলে
ভারতরসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান—
হে কাশী ! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্।

# আত্মবিলাপ

## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবনকুসুমভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি

৩

নিশার স্বপনসুখে সুখী যে, কী সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে

মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে।—
এ তিনের ছল-সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কী ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি, অবোধ, হায়—
না দেখিলি, না শুনিলি; এবে রে পরান কাঁদে।

৫

বাকি কী রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণালকণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে—

মাৎসর্যবিষদশন   কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতাফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধুজলতলে
ফেলিস, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন—
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?

# দধীচির তনুত্যাগ

## হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রসরি শচীপতি সহস্রলোচন
তপোধনশিরঃ স্পর্শি সুকরকমলে,
কহিলা আকুল স্বরে ( শুনি ঋষিকুল
হরষবিষাদে মুগ্ধ ), কহিলা বাসব,
"সাধুশিরোরত্ন ঋষি, তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী-তলে
চিরমোক্ষফলপ্রদ— নিত্যহিতকর !···
কর্তব্য নরের নিত্য স্বার্থপরিহার,
জীবকুলকল্যাণসাধন অনুদিন !

পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম যে পরম
তুমিই বুঝিয়াছিলে— উদ্‌যাপিলে আজ !
কী বর অর্পিব আর, নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোনো বর ; এ সুকীর্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে !
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতখ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি-মাঝে।”
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল।
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদগান,
উচ্চে হরিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর।
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ ; ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে !···
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ— ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

# আশা

**নবীনচন্দ্র সেন**

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্বল মানবমনোমন্দিরে তোমায়
যদি না স্বজিত বিধি, হায়, অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে—
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশপ্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দিরশোভা! পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়,
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবনযুদ্ধ, হায়, অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।

ওই-যে কাঙাল বসি রাজপথধারে
দীনতার প্রতিমূর্তি— কঙ্কালশরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দুর্গন্ধ-আধার,
দু-নয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্বাপিত ; রুগ্‌ণ কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কী মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
নতুবা যে পথে কোনো কবি বিচরণ
করে নি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বলো কুহকিনি,
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে

দোলাইব মাতৃভাষা-কম-কলেবরে—
সুকবি-সুকরে গাঁথা মহাকাব্যধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে, তোমার মায়ায় ;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায় ;
অতএব দয়া করি কহো, দয়াবতি,
কী চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেতসেনাপতি ?



## মধ্যাহ্নে

অক্ষয়কুমার বড়াল

একেলা জগৎ ভুলে পড়ে আছি নদীকূলে
পড়েছে নধর বট হেলে ভাঙা তীরে ;
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে ।
চাতক কাতরে ডাকে, চরে বক নদী-বাঁকে,
ডাকে কুবো কুব্ কুব্ লুকায়ে কোথায় !
গাভী শুয়ে তরুতলে, হংসী ডুবে উঠে জলে,
ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায় ।

দূরেতে পথিক দুটি চ'লে যায় গুটি গুটি
মেঠো পথ দিয়া ।
পাশ দিয়ে নিয়ে জল আঁখি দুটি ঢল ঢল,
কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিয়া ।

নিঝুম মধ্যাহ্নকাল অলস-স্বপন-জাল
রচিতেছে অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া।
দূর মাঠ-পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে
রয়েছি পড়িয়া।

হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কী স্বপন-ভরে,
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কী আরামে!
অন্যমনে চাহি চাহি কত ভাবি, কত গাহি
পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে।
খ'সে খ'সে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে।

# ভারততীর্থ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্ত শিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো·করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,এসো এসো খ্রীস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

# প্রতিনিধি

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অ্যাক্‌ওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠী গাথার যে ইংরাজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা একদিন—
রামদাস, গুরু তাঁর, ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড!
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ—
সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ!

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে।
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।"

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ—
“হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্বচরাচর—
মোরে তুমি, হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।”

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ ;
কহিলেন, “পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব গুণী ?”
“তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান”
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।

গুরু কহে, "এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরোথরে ;
ভাবে, ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম-কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি,
"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি!"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।

রাজা তবে কহে হাসি— "নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।"

গুরু কহে, "তবে শোন্ করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে, মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

"বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস ;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু ;
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পূরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,

"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস।
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।"

# প্রাচীন ভারত

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, উদ্ধতললাট
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে—
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্জনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সংগীত আর নূপুরঝংকারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়তধ্বনিতধ্মাত কর্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার—
নির্বাক্‌, গম্ভীর, শান্ত, সংযত, উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

# প্রার্থনা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

# ধূলামন্দির

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে?
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধূলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি! মুক্তি কোথায় আছে!
আপ্নি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

# শুচি

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ—
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব—
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে—
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে।
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
"ঠাকুর, কি অপরাধ করেছি?"
ঠাকুর বললেন, "আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে

সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে ;
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।"
"লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু"
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল ; বললেন,
"যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও,
এতবড়ো স্পর্ধা !"
রামানন্দ বললেন, "প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।"

তখন রাত্রি তিন-প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন,
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে, শুনতে পেলেন—
"সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।"
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, "এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।"

ঠাকুর বললেন, “প্রভাত কি রাত্রির অবসানে ?
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।”

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, “প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি— অপরাধী করবেন না আমাকে।”
গুরু বললেন, “অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।”

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্-গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।

কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,

"প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,

আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।"

রামানন্দ বললেন, "এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি, বন্ধু,

তাই অন্তরে আমি নগ্ন,

চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,

আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে,

আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।"

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে ;

ধিক্‌কার দিয়ে বললে, "এ কী করলেন প্রভু!"

রামানন্দ বললেন, "আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম

আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।"

সূর্য উঠল আকাশে,

আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

## নন্দলাল

### দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—

স্বদেশের তরে যা' ক'রেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।

সকলে বলিল, "আ-হা-হা কর কী, কর কী নন্দলাল?"

নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?

আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?”
তখন সকলে বলিল, “বাহবা, বাহবা বাহবা, বেশ !”

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা ?
সকলে বলিল, “যাও-না নন্দ, করো-না ভায়ের সেবা।”
নন্দ বলিল, “ভা’য়ের জন্য জীবনটা যদি দিই
না’হয় দিলাম— কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক।”
তখন সকলে বলিল, “হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক !”

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন—
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল, “বাহবা, বাহবা নন্দলাল !”

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি।
নন্দ বলিল, “আ-হা-হা ! কর কী, কর কী, ছাড়ো না ছাই,
কী হবে দেশের, গলা-টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই !
বল ক’ বিঘৎ নাকে দিব খত, যা বল করিব তাহা !”
তখন সকলে বলিল, “বাহবা, বাহবা বাহবা, বাহা !”

নন্দ বাড়ির হ’ত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি !
চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উল্‌টায় গাড়িখানি।

নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়িচাপা-পড়া ভয় !
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল, ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল !

# মা আমার

## কামিনী রায়

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি— মা আমার, মা আমার !

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটোখাটো সুখ দুঃখ কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ— মা আমার, মা আমার !

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়।
গাহি যদি কোনো গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে— মা আমার, মা আমার !

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে।
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক প্রাণ— মা আমার, মা আমার !

# বাঙালীর মা

## প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেতছত্র ধরে,
মেঘের ঝালর তায় ঢেউ খেলি দিক্ শোভা করে।
গর্জে নিম্নে গর্ গর্ লক্ষফণা অজগর—
বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়।

তব মুক্তবেণীসম শোভা পায় সুনীল অটবী,
কাঞ্চীসম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়া জাহ্নবী।
হিরণ-হরিতে গড়া সরিতে সরিতে ভরা
আনন্দ-ভুবন তব আমোদিত কলকলগীতে,
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধূলায় লুটিতে।

চরে তব শ্যাম গোঠে বেণুরবে ধবলী শ্যামলী,
কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরান অঞ্জলি।

রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণকমল হাতে
জ্যোৎস্না নামে মৃদুপদে ঝাঁপি ল'য়ে লক্ষ্মীর মতন
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ।

ব্রহ্মপুত্র দামোদর বৈতালিক দুটি জলসখা,
নাচে পদ্মা ঝঞ্ঝা-সনে শিরে ল'য়ে অশনিকরকা।
অজয়ভৈরব ঘুরি বাজায় বিজয়তূরী,
তব মেঘধারাযন্ত্রে ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয়—
ক্ষুধিতে জোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়।

নিখিলসাগর-অঙ্কে তুমি যেন কমলে কামিনী,
বসে আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবসযামিনী !
ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই করী শান্তি ঘট শূন্যে ধরি
ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদকসুধা,
নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা !

কিরণের ছড়া উষা দিয়ে যায় তব আঙিনায়,
সন্ধ্যা ধূপদীপ জ্বালি করে আসি আরতি তোমায়।
মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ 'মা' বলিয়া দেয় ডাক—
তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান,
তোমারে আশিসি পুন নমেন আপনি ভগবান।

৮

# জীবন-ভিক্ষা

## করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা-গোতমী

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, দুলালে আগলি' বক্ষে
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দরবিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন ;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণশ্যেনের পক্ষে।

স্তনক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত ?
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধরকমলপর্ণ—
কী পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষবিন্দুরিক্ত ?

কোথা সে মাধুরী আধো আধো বোলে ? কুন্দ বৃন্তছিন্ন,
দন্তরুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতলি জাগিবে হরষে।
কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন ?

অবনীর এই পদ্মবেদীতে হরিলে ত্রিতাপদুঃখ,
যাত্রা করেছ দুরগম পথ ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম।
দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমার কর প্রাণদান।"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে,আলুথালু কেশ রুক্ষ।

কহেন বুদ্ধ, "তনয় তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোক নিলয় ভিখ্ মাগি আনো সর্ষপচয়,
পরশে তাহার ছুলিয়া উঠিবে পরান-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা ;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে, "শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হরো জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃতদীক্ষা।"

## জন্মভূমি

### যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা 'আইরি' খেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পুবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি !

বাঁশ-বাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজনে গাছের শাখা,

গোরুর গাড়ির চাকার পথে শুকায় নাকো কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে ঘুঁটে-ছাইয়ের গাদা—
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্বশোভা ঐখানেতে গেছে চুরি !

যত দেশের যত পাখি ঐ গাঁয়ে কি আছে !
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে বাসার কাছে কাছে ;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চলতে গেলেই শুক্‌নো পাতা গুঁড়োয় পায়ে পায়ে
বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি !

পদ্মদিঘি কোথায় পাব— পদ্ম নাইকো মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে উঠে, জলটুকু না জোটে !
পানায় মরা, ডোবায় ভরা, সিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাট-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া
এমনি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী,
স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি !

পাঠশালাটি নাইকো গাঁয়ে— নাইকো সে ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি, যদিও কম্‌তি নয়কো বড় জর ;
রাজার প্রাসাদ নাইকো সেথায়, ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী
সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি !

তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায় কদমতলার ধারে
সংকীর্তনে মিলন-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে,
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন হারা—
আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা ;
এমনি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাই তো আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

শোভা বল, স্বাস্থ্য বল— আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে ;
ঐখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, প্রিয়ার হাসিমুখ ;
তাই তো আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি !

# আমরা

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে
বাম হাতে যার কম্‌লার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা,
ভালে কাঞ্চনশৃঙ্গমুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনকধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,

সাগর যাহার বন্দনা রচে শততরঙ্গভঙ্গে—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি ;
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,-
চাঁদপ্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চনকোকনদে !

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে ওংকারধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিটপাল আর ধীমান্— যাদের নাম অবিনশ্বর।

আমাদেরই কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি'।
দেবতারে, মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরই এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর-হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া।
আমাদের এই নবীন সাধনা শবসাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী-জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালার গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশি,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি—
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

# ছোটোর দাবি

## শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোটো যে হায় অনেক সময় বড়োর দাবি দাবিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটোর গতি, বড়ো যে জল গাবিয়ে চলে,
অতি-বড়ো তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়োর অট্টহাসি ছোটোর কণা নয়ন-জলে।

তরুবরে হয় না স্মরণ, কুসুমটি তার ভুলতে নারি;
ভুলতে পারি হোলির দিবস, ফাগের দাগ যে তুলতে নারি।
ভুলি সাগর— তার মুকুতায় গেঁথে রাখি গলার মালায়,
ছোটোর অনুরাগের রাখী আয়াস করেও খুলতে নারি।

রামায়ণের অনেক ভুলি রাবণ-রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন গুহক-গৃহে মিতার সাথে।
ভুলি কোশল-পৌরভবন ভুলতে নারি অশোক-কানন,
সরমার সে সখীত্বটি বন্দিনী মা সীতার সাথে।

ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা, কংসবধের গৌরবও।
ভুলায় কুরুক্ষেত্র গোটা বিদুর-ক্ষুদের সৌরভও।
বাঁশরী আর শিখীর পাখা সুদর্শনকে দেয় যে ঢাকা,
সুদামার প্রেম-সখ্যে যে ম্লান পাণ্ডব এবং কৌরবও।

ভুলতে পারি সারনাথ আর নালন্দা-মঠ-ধ্বংসটিকে,
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে।
হাজার হাজার মূর্তি তাঁহার উহার কাছে মানছে যে হার
পূর্ণতা দেয় বিরাট ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে।

মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাদ্যঘটা, লক্ষ বলি, অলক্ষ্যে সব যায় যে চলি—
বক্ষে জাগে দৃষ্টি মায়ের, মিষ্ট হাসি চন্দ্রাননে।

আদর করি শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা শিখীর পাখা,
বিশাল রসাল-বনের চেয়ে ঘটের ছোটো আমের শাখা।
খনি রেখে মণিই তুলি, মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি
মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা।

# হাট

## যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পুবের মাঠ।
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে ওঠে দীপ— আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে।
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল-চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত-না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশিরবিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা !
হিসাব নাহি রে— এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা !

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা !
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো— যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা !

## কাল-বৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে !
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে !
কানন-আনন পাণ্ডুর করি
জলস্থলের নিশ্বাস হরি
আলয়ে কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি তুলিয়াছে প্রাণ ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ ?

হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা !
অথবা ও কি রে সচল অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মিছটা !

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার !
শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব— নাসাগর্জন ঝঙ্কার।
পিঙ্গল হল গলতলদেশ,
ধূলিধূসরিত উন্মাদবেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার।

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক্ হতে দিক্-অন্তে !
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে।
বাজে ঘন ঘন রণদুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি,
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর প্রান্তে !

বঙ্কিমনীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন ?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন ?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘকজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হল ছিন্ন।

হেরো, ফিরে চলে সে রণবাহিনী বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্মল হল— ধৌত ধরার পঙ্ক।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে,
নদী উথলিছে কুলুকুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বসে নিঃশঙ্ক।

...

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে—
হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি—
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি— তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির !

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরই মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া,
নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া—
ওরই মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।

# ত্রিরত্ন

## শ্রীকালিদাস রায়

এল দিগ্‌জয়ী দিগ্‌গজ বীরপণ্ডিত ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজবনে নামে।
অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা চারণ ফুকারি চলে,
চতুর্দোলায় পণ্ডিত দোলে বিজয়মাল্য গলে।
জয়নাদ তুলি অনুচরগুলি চলে তার পাছে পাছে,
ভয়ে সবে পুঁথিপত্র গুটায়ে কেহ না আগায় কাছে।

রূপ সনাতন রহেন দু জন সাধনভজন-রত,
কে আসে কে যায় ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অতশত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে সারা দেশে,
বিচারমল্ল তাই শুনে আজ অভিযান করে শেষে।
দুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি বিভোর আছেন সুখে,
'যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।

পরমাগ্রহে মৃদু হাসি দোঁহে বসাইয়া সমাদরে
বিজয়পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়-ভিখারীর করে।

বিজয়গর্বে তূর্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।
পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু ধারে দাঁড়ায়ে সরি,
সিক্তবসনে শ্রীজীব তখন ফিরিছেন স্নান করি।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া আস্ফালন—
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন!'

শুনি শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল, বলিলেন, "পণ্ডিত,
এসো, আমি দিব দম্ভের তব প্রতিফল সমুচিত।
যাঁদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ করেছিলে অভিযান,
তাঁদের আমি তো চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান;
পেয়েছি তাঁদের জ্ঞানসাগরের শুধু এক অঞ্জলি,
মোরে জিনি তবে জয়গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি।"

তরুণ কণ্ঠে শুনি অকুণ্ঠ রণে-আহ্বান-বাণী
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী,
বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে?
পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে?"
বাহকবৃন্দে বলিল সে, "চল্, কেন রয়ে গেলি থেমে!"
জীব বলিলেন, "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এসো নেমে।"

তর্ক বাধিল যমুনার তীরে— দলে দলে সেথা আসি
দুই মল্লেরে দাঁড়াইল ঘিরে কুতূহলী পুরবাসী।
হানিতে লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ,
হেলায় সে-সব করিলেন জীব খণ্ডিত খান খান!
দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে "ধিক্ ধিক্।"

অবনতশির বিতণ্ডাবীর পাণ্ডুর মুখে ধীরে
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।
ব্রজবাসিগণ শুভসংবাদ ভাবি, পুলকিত মনে
জানাল এ কথা— বিজয়-বারতা— রূপ আর সনাতনে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরি হল ফিরিতে জীবের ঠেলি জনতার মেলা।

কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করে নি কেহই অন্নজল—
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল?
শুচি হয়ে আজ আসো নাই তুমি স্নান করি যমুনায়,
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।
মুখদর্শন করিব না তব— বৃথা তোমা পালিলাম,
রাজসভা তব সুযোগ্য ঠাঁই, নহে এই ব্রজধাম।"

চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হল না ক্ষয়।

শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল
আশ্রয় করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল।
সকল সময় চোখে ধারা বয় ফুলে ফুলে উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম জপে অবিরাম বসেন ঢাকিয়া মুখ।

শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন মর্মে পেলেন ব্যথা,
করিল কাতর তাঁর অন্তর শ্রীজীবের কাতরতা।
বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন?
বৈষ্ণবগুরু হয়ে তবে কেন বিকৃত বুদ্ধি হেন!
গুরুমর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি তো দেখি না এর বেশি কিছু গুরুতর অপরাধ।"

রূপ কহিলেন, "বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন?
হয়ে বৈষ্ণব জ্ঞানের গরব করে নি সে বর্জন।
তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব— জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো।
গুরুমর্যাদা?— হায় অদৃষ্ট, গুরুরেও সে না চিনে,
এত উপদেশে হল হায় শেষে এ শিক্ষা এতদিনে!"

শুনি সনাতন মৃদু হেসে ক'ন, "জিনিবারে অভিমান
পারে নাই জীব, এখনো বালক, আমাদেরি সন্তান।
তুমি তার তাত, তুমি গুরু, ভ্রাতঃ, পারিলে না আজো হায়
বৈষ্ণব হয়ে রোষ জিনিবারে— দোষ কিছু নাই তায়?

সেই অছিলায় ত্যজিব তোমায় ? দীনতার অভিমান।
তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান ?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে, বৈষ্ণব মোরা নই ;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, 'জীবে' দয়া তব কই ?"

এ কথা শুনিয়া চমকি উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি—
"কী কথা শুনালে ! হায়, তার চেয়ে আমিই তো অপরাধী ?
বৈষ্ণব হয়ে ক্ষমা করিতে তো পারিনিকো সন্তানে,
না বুঝে অশনি হেনেছি জীবের কুসুমকোমল প্রাণে !
যাও ভাই যাও, এক্ষণি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তারে,
না জানি কত-না পায় সে যাতনা এ মূঢ়ের অবিচারে।"

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন, কঙ্কালসার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন, চিনিতে পারে না কেহ।
জীবে বুকে ধরি কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মতো,
বার বার তার ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ,
শুচি হল তায় দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি ব্রজ !

# কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

## কাজী নজরুল ইস্‌লাম

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

তিমিররাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা, সাবধান !
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ !
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথমাঝ ?
ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর !
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার ।

# শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শাঙ্গর্রব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, যথাসম্ভব, বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি, শোকাকুল হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্শক্তি-রহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কী আশ্চর্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কী দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান করো; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন করো।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত, আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা

উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কী অবস্থা ঘটিতেছে, দেখো! জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া, রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, উর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া, যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু-দ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন করো; আজ অবধি আমি দূরবর্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বলো। এই বলিয়া উভয়ে শোকাকুল হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বলো। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনোই ভুলিব না।

কতিপয় পদগমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, 'আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে' এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন,

বৎসে ! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে, তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে ; যাহার আহারের নিমিত্ত, তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে ; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ-দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে ; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা ! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও ; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম, এখন আমি চলিলাম ; অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে ! শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ করো, পথ দেখিয়া চলো; উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনকার আর অধিকদূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই ; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস ! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে— আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি ; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; আর, শকুন্তলা, বন্ধুবর্গের অগোচরে, স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই-সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে ; আমাদের এই পর্যন্ত প্রার্থনা ; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা

বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতি-গৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখি-ব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে ; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না ; স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন করিলেও, রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয় ; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখো, গৌতমীই বা কী বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কী বলিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে ! আমরা আর অধিক দূর যাইব না ; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন করো। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবেক ? ইহারা সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে ! ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব, সে পর্যন্ত যাওয়া ভালো দেখায় না ; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, তাত ! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব ? এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে ! এত কাতর হইতেছ কেন ? তুমি, পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত ! আবার, কত দিনে, এই তপোবনে আসিব ? কণ্ব কহিলেন, বৎসে ! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহত-প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের

ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতিসমভিব্যাহারে, পুনরায়, এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায়; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন করো। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া, অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বলো। তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্তরাজধানী-উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে, শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন করো। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ, অদ্য আমি, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

# সাগরসঙ্গমে নবকুমার

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীস ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত রাখিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?"

মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না— ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কী, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে পিলে সম্বৎসর খাবে কী?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম,

মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে! এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি তো আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'আহা! কী দেখিলাম। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥'

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল তাহাই একতান-মনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই, এ তো বড়ো কাজটা খারাবি হল—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম, কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোনো বিপদ্-আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কী হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দিক্ অতিগাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে—আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোনো দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার

নিশ্চয়তা পাইতেছে না— পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ-জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ-সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকা-মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিলেন, "কেনারায় পড়্! কেনারায় পড়্! কেনারায় পড়্!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোনমতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে। চারি-পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ করো, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড়ো জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই— সে'ই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ-পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কী! কী! মাঝি, কী হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখো ডাঙা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কী বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র; কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে, এমন-কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর, যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া, গগনপ্রান্তে গগন-সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম-নদীজল-বর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ; আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য-প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে 'রসুলপুরের নদী' নাম ধারণ করিয়াছে।

আরোহীদিগের স্ফূর্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে নাবিকেরা প্রস্তাব

করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস-আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্‌যোগে আর-এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল— নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব ; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া এক জন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর-মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই— কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে— কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোনো কোনো ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া আছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না ; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর-এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ-সকল কর্মে

অভ্যাস ছিল না ; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ-আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভারবহন বড়ো ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক্, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোনোমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন ; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ দিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল ; অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশি মধ্যে ভৈরবকল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ-সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে, নৌকা সামলাইতে পারিল না ; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুরের নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। এক জন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে!" এক জন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে 'শিয়ালে' খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এইজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন-কি সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম-দ্বারা রসুলপুরের নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহা তিলার্দ্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্তন করা আর-এক ভাঁটার কর্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকাচালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ, নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত, তাহারা কথার বাধ্য নহে; তাহারা বলিতেছে, যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশস্বীকার কী জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস-

নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে— কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক-না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম— তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

# বসন্তের কোকিল

কমলাকান্তের উক্তি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ-বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো দুলালী-ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে ? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না— তোমার মতো আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পূরিয়া যায়— কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়— কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজীতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবতকাকলীসংকুল গৃহসৌধবৎ মুখরিত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়িতে নাচ গান যাত্রা পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল

আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তুলে— কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাসে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপিড়ার সারি দেয়। আর, যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও বড়ো সুখ, একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে ; বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন ?

তা, ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাকো ! ঐ অশোকের ডালে বসিয়া, রাঙা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মতো লুকাইয়া রাখিয়া একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে কু—উঃ বলিয়া ডাকো। তোমার ঐ কু—উঃ রবটি আমি বড়ো ভালোবাসি। তুমি নিজে কালো, পরান্ন-প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু" ; তবে যত পার ঐ পঞ্চমস্বরে ডাকিয়া বলো "কু—উঃ"। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ হিংসা ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ" ; কেননা, তুমি সৌন্দর্যশূন্য, পরান্ন-প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া উপর্যুপরি-বিন্যস্ত পুষ্পস্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল, তখনই ডাকিয়া বলিও "কু—উঃ" ; যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এক কালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও "কু—উঃ"।

যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না (পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙিয়া গলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে)— তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে, তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও "কু—উঃ"।

যখন দেখিবে, শুভ্রমুখী শুদ্ধশরীরা সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোকপ্রাখর্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে— স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে— যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া 'আদরেতে আগুসারি' কণ্ঠ-ভরা গুন্ গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে— তখন, হে কালামুখ, আবার "কু—উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও।···

ঐটি তোমার জিত, ঐ পঞ্চমস্বর। নহিলে তোমারও "কু—উঃ" কেহ শুনিত না (এ পৃথিবীতে গ্লাড্‌স্টোন ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়, তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে; নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভালো।···)

তবে কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া, নক্ষত্রময়, নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভাগৃহে তোমার এ মধুর পঞ্চমস্বরে "কু—উঃ" বলিয়া ডাকো— সিংহাসন হইতে হস্টিংস্ পর্যন্ত সকলে কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ।"— ভালো, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈকি, সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়; রূপ বিকৃত হয়। কু—উঃ বটে— তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চমস্বরে বলিলেই কু মানিব— নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কুক্কুকু" বলিয়া আমার

সুখের প্রভাতনিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; (যদি শব্দমন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে।)

এখন আয় পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে আমিও সে— সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে, আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস— আমিও এই সংসারকাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই— আয় ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই, আনন্দ আছে; আমারও কেহ নাই, আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা, আমার পুঁজিপাটা এই আফিমের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভালোবাসিস, আমিও তাই— তুই পঞ্চমস্বরে কারে ডাকিস? আমিই বা কারে? বল দেখি পাখি, কাকে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভালো, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই-যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি; আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা। তুইও কিছু জানিস না। আমিও জানি না; তোর ও ডাক পৌঁছিলে আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোনো কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চমস্বরে ডাকি।

তবে কুহরবে সাধা গলায় কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলানো স্বর পাইতাম তো বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখি রে! কী কথাটি 'বলিব বলিব' মনে করি, বলিতে জানি না; সেই কথাটি তুই

বল্ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই, অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী-মধ্যে উড়িয়া, কখনও কি "কুহু" বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল, আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে!

# প্রতিভা

## রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূমণ্ডলে যে-সকল লোক প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল পুরাতন জ্ঞান ও কার্যপ্রণালীতে সুপরিপক্ব, অপরদল নূতনপথদর্শী। একদল অন্যনির্দিষ্ট কর্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, অপর দল ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন গড়িতে বা অভিনবপ্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিতে পারেন। প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী এবং শেষোক্তদিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়।

কেহ কেহ অন্য-নির্মিত কল দেখিয়া তদনুরূপ গড়িতে পারেন, অন্যাবিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন, বা অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলংকৃত হইতে পারেন। কিন্তু নূতন কল-নির্মাণ, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা নূতন ভাবের উদ্ভাবন, তাঁহাদিগের শক্তিসাধ্য নহে। এরূপ লোক কার্যক্ষম, বিজ্ঞানবিদ্ বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্তু প্রতিভাশালী বলা যাইবে না। তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আদ্যন্ত রামায়ণ যাঁহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্তায় ও লিখন-পঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন

ক্ষমতাপন্ন হউন-না তাঁহার ঈদৃশী দক্ষতা আদিকবি বাল্মীকির নূতন-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-কারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন।

পূর্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অন্ধকারময় অতীতকাল ভেদ করিতে গিয়া রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি। এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে, শকুন্তলাপ্রণেতা কালিদাস মহামূর্খ ছিলেন, পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে কাননে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশেও ঈদৃশী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডীয় পুরাবিদ্ বিডি সাহেব বলেন যে, প্রসিদ্ধ সাক্সন কবি সিড্‌মন্ প্রথমে এমন সঙ্গীতরসাস্বাদবিহীন ছিলেন যে, গান শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, পরে স্বপ্নাদেশবশতঃ তাঁহার অত্যাশ্চর্য গীতিশক্তি জন্মে। যদিও ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ প্রকার আকস্মিক দৈবশক্তির আবির্ভাব অপ্রামাণ্য ও অনৈসর্গিক, তথাপি, প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একদল হয়তো গণিত বুঝিতে পারিবে না, সাহিত্যরস পান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অম্লানমুখে বলিবে, "ইহাতে তো কিছুরই উপপত্তি হইল না।" কেহ হয়তো একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সঙ্গীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা সুরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া গীতসাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রফুল্ল কুসুমোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভালোবাসিবে; কেহ বা তরুলতাশূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূনপরিপূরিত

বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টিসাধনার্থ আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল, কার্যে অপটু ; কেহ বা কার্যদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তি-ভেদ যে প্রতিভার মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, আমি তুমি সকলেই কালিদাস বা আর্যভট্ট, সেক্ষপিয়র বা নিউটন হইতে পারিতাম।

প্রতিভা যদিও আমাদিগের মতে স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। যদি কেহ আপনাকেপ্রতিভাশালী মনে করেন, তিনি যেন স্বপ্নেও ভাবেন না 'আমি শিক্ষা-ব্যতিরেকেই বড়লোক হইব'। সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ।

যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী। সেক্ষপিয়র 'কল্পনার পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহাকে লোকে অনেক দিন ধরিয়া অশিক্ষিত ভাবিয়া আসিয়াছে, তাঁহার নাটকনিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তিনি তাৎকালিক অনেক ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ ও বহুবিধ নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আইনে ও লাটিন ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। যে কালিদাস 'সরস্বতীর বরপুত্র', তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না। তিনি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি পড়িয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস অন্যান্য শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অশিক্ষিত না হইলেন, তবে আমরা একপ্রকার ধরিয়া লইতে পারি যে, শিক্ষা-ব্যতিরেকে কেহই বড়োলোক হইতে পারে না। শিক্ষার স্থল অনেক— বিদ্যালয়, গ্রন্থ, মনুষ্যসমাজ, বাহ্যজগৎ। ইহাদের মধ্যে কেহ একটি কেহ অপরটি হইতে বিশেষ সাহায্য পান। কিন্তু যত্নপূর্বক অধ্যয়ন না করিলে কোনোটি হইতে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অপর পক্ষে, কেহ কেহ বা শিক্ষার অমৃতময় ফল সন্দর্শন করিয়া এমন মোহিত হন যে, তাঁহারা প্রতিভাকে স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার

করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগ মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, 'যে কার্য কোনো ব্যক্তি বারংবার করে বা যে বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, তাহাতেই তাহার একপ্রকার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে—উহাকেই প্রতিভা কহে; বাস্তবিক, সৃষ্টিকর্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন ইহা সম্ভব নহে।'

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রতিভা অভ্যাস মাত্র—এই মতটি কতদূর সুসঙ্গত। যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব? অনেক পদ্যলেখক আছেন যাঁহারা ছন্দো-গ্রন্থনে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন কবি? ভট্টিকার বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন, কিন্তু কে তাঁহাকে রঘুবংশরচয়িতার সহিত তুলনা করিবে? তিনি বিলক্ষণ পদ্য লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে?

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে এ বিষয়ে মীমাংসা সহজ হইবে। অভ্যাস কার্যসমষ্টিজাত। একটি কার্য বারংবার সম্পাদন করিলে তৎ-সম্পাদন পূর্বাপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য হয় এবং তৎপক্ষে প্রবল প্রবৃত্তি ও দক্ষতা জন্মে। যে বারংবার অনুষ্টুপ্ লিখে, সে সহজে অনুষ্টুপ্ লিখিতে পারিবে, কিন্তু বাল্মীকি হইতে পারিবে না।

অভ্যস্ত বিদ্যা পুরাতনাতিরিক্ত হইতে পারে না। লোকে যাহা করিয়াছে, অভ্যাস-দ্বারা তাহাতেই পারদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু যে 'নূতন সৃষ্টি' প্রতিভার অন্তরাত্মা-স্বরূপ তাহা অভ্যাস কোথা পাইবে? আমি ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া অভ্যাস করিতে পারি; কিন্তু তাদৃশ অভ্যাস-দ্বারা তাঁহাদিগের নিরূপিত তত্ত্বগুলিই জানিতে পারিব, অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব না।

যাহারা বিবেচনা করেন প্রতিভা মনোযোগমাত্র, তাঁহাদিগেরও বিবম

ভ্রম। যে বিষয়ে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা যায়, সে বিষয়ের সেই পরিমাণে স্মরণ থাকে। কিন্তু স্মরণ-দ্বারা পূর্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটি নাই। কাজে কাজেই প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বলা যাইতে পারে না।

যদিও মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে, তথাপি তাহারা প্রয়োজনীয় সহকারী। যিনি কোনো বিষয়ে নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহার তদ্‌বিষয়ক পুরাতন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। পুরাতন-তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য মনোযোগ ও অভ্যাসের প্রয়োজন। এইরূপ পুরাতন-তত্ত্ব-সংগ্রহই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এইজন্যই আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। কিন্তু যাহারা ঈদৃশ শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহারা প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী ; প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিনবতত্ত্বমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।

# মহাত্মা রামমোহন

## শিবনাথ শাস্ত্রী

মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই কারণে পৃথিবীর যে-কোনো বিভাগে লোকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত, এবং স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসে কোনো জাতি অকৃতকার্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্মাহত হইতেন। ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার

পর যখন অস্ট্রীয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার টাউন-হলে ভোজ দিলেন। তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ডিগ্‌বীসাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম করিবার সময় ডিগ্‌বী অনেকবার দেখিয়াছেন যে, রামমোন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতাসহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতা-পক্ষের পরাজয় হইতেছে তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দুই কপোলে অশ্রুধারা বহিত। কুমারী কলেট বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড্-গমনকালে গুড্‌হোপ অন্তরীপে গিয়া জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তখন ভগ্নপদ লইয়াই সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন, সে নিষেধ তিনি কোনোমতেই শুনিলেন না; ভগ্নপদে অতিকষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন।

তাঁহার ইংলণ্ড্-বাসকালে, ১৮৩১ সালে, পার্লেমেণ্ট্ মহাসভাতে সুপ্রসিদ্ধ রিফর্ম্ বিলের বিচার উপস্থিত হয়। ঐ আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব হয়। রামমোহন রায় সেই প্রস্তাবে আপনাকে এতদূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলেন যে, ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে তিনি ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিবেন না, তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিবেন! কী স্বাধীনতাপ্রিয়তা! কী মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান!

এই মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান আর-এক দিকে অসাধারণ আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার বন্ধু উইলিয়ম এডাম এক দিনের একটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই— একদিন রামমোহন রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহ্নে হঠাৎ এডামের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডাম দেখিলেন, তাঁহার মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। রামমোহন রায় বলিলেন, "তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি!" পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "জল! জল!"— ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিড্‌ল্‌টন আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড়ো হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটোলোক মনে করে?"

এডাম বলিয়াছেন, ইহার পরে রামমোহন রায় আর বিশপ মিড্‌ল্‌টনের মুখদর্শন করেন নাই। বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করা, ইহা তাঁহার চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, অসহনীয় অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্মশক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না, কোনো বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। ইংরাজী বুল্‌ডগ-নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে

প্রাণীকে কামড়াইয়া ধরে, তাহার দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্‌ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল, তাঁহার অভীষ্ট কার্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত ততই তাঁহার বীরহৃদয় আনন্দিত হইত।

বিঘ্ন দেখিয়া হঠিয়া যাওয়া, ভয়প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা-বশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজ শক্তির আবমাননা বলিয়া মনে করিতেন। ব্যাপ্‌টিস্ট্‌ মিশনের মিশনারিগণ যখন তাঁহার প্রণীত Third Appeal to the Christian Public তাঁহাদের ছাপাখানায় মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন তখন তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া লোকদিগকে কম্পোজিটারের কাজ শিখাইয়া, নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া তবে ছাড়িলেন। স্কচ মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডফ্‌ যখন তাঁহার আহ্বানে কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথম মিশনারি স্কুল-স্থাপনের পথে প্রবল বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, তখন শহরের ভদ্রলোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ি ভাড়া করা ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ডফের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্ন বাধার কথা জানাইলে তিনি ডফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি তো কিছুতেই পিছু-পা হইবার লোক ছিলেন না। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাশ্রিত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ি ডফের স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দিলেন এবং আপনাদের বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না ; স্কুল খুলিবার দিন নিজে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন এবং তৎপরে সর্বদা গিয়া স্কুলের কার্য পরিদর্শন-দ্বারা ও পরামর্শদানাদি-দ্বারা ডফকে উৎসাহিত করিতে

লাগিলেন। তিনি বিলাত-গমনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় অভীষ্ট-সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিজের সহিত যাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করিলেন। যে সময়ে সমুদ্রে পা বাড়াইলেই জাতিচ্যুত হইবার ভয় ছিল, সে সময় বিলাত গমনের জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন কাজ ছিল সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। যিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতা-কর্তৃক গৃহতাড়িত হইয়াও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুই বিচিত্র ছিল না।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড়ো হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোটো হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা, পাপ-প্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়। তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড়ো বা ছোটো হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বড়ো ; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এইজন্য আমরা ছোটো। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন তাহারও ভিতরকার কথা নিজের শক্তিসামর্থ্যের ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

# সমুদ্রপথে

## হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ক্রমে ডিঙাগুলি গিয়া বালীদ্বীপে পঁহুছিল। সেই জায়গাটাকে বড়ো আড্ডা করিয়া বিহারী সমস্ত দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যবদ্বীপ,

সুমাত্রা, বোর্নিও, সব জায়গাই এক-একবার ঘুরিলেন। কর্মচারীদের কাজ-কর্ম তদারক করিলেন। হিসাব দেখিলেন। বাহাল-বরখাস্ত করিলেন। দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসায়ের পথ ফলাও করিলেন। এইরূপে চারি পাঁচ মাস থাকিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবারে ব্যবসায়ে অনেক লাভ হইল ; কারণ যে-সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন, তত ভালো জিনিস, আর তত বেশী জিনিস আর কখনও পান নাই। সুতরাং তিনি খুব খুশী। তাঁহার সংস্কার, মেয়ের পয়েই তাঁহার লাভ বেশী হইয়াছে ; সুতরাং মেয়ের উপর তাঁহার ভালোবাসা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েও খুব খুশী। বিহারীর সঙ্গে যাহারই কারবার ছিল, সকলেই মেয়েকে খুব আদর করিয়াছে, নানা জিনিস দিয়াছে। রাজারা মেয়েকে কোলে করিয়া তাহাকে খাবার দিয়াছেন, গহনা দিয়াছেন। সে যাহা দেখিতে চাহিয়াছে সব দেখাইয়াছেন। সব মন্দিরে সে গিয়াছে, সব জায়গায় পূজা দিয়াছে সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে। তথাপি দেশে ফিরিবার নামে তাহার বড়োই আনন্দ। দেশের এমনি টান। আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরানো খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা করিবে, গঙ্গায় স্নান করিবে, ঠাকুরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিবে, তাহার ভারি আহ্লাদ।

ক্রমে ক্রমে উনপঞ্চাশখানা ডিঙা আসিয়া বালীদ্বীপে জুটিল। যার যা মেরামতের ছিল মেরামত করা হইল। সব ডিঙা আবার বাঙ্গালার দিকে চলিল।

সব ডিঙা ভাসিল, কেহ বলিল 'জয় কালী,' কেহ বলিল 'জয় সাতগাঁয়ের কালী', কেহ বলিল 'জয় গঙ্গামা'র জয়', কেহ বলিল 'জয় বরুণদেবের জয়', কেহ বলিল 'জয় সমুদ্রের জয়'। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। যাবার সময় স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া পাল তুলিয়া আসিয়াছে। আসার সময়ও ঠিক সেই ভাব। বিহারীর আনন্দ ধরে না ! সে এক-একবার

ছইএর উপর উঠিয়া ডিঙা গণিয়া দেখে; সব ডিঙাই চোখের সামনে আছে। মনে মনে লাভালাভ কষে আর দেখে যে, এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনোই হয় নাই।

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। একদিন সকালে উঠিয়া দেখিল, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালো মিস্‌মিসে একখানা মেঘ উঠিয়াছে। মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড়ো সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন ওখানা ভালো নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশী নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।"

বলিতে বলিতে ঝড় উঠিল। প্রথমে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, তাহার পর ঝাপ্‌টা, এক এক ঝাপ্‌টায় নৌকাগুলা যেন উল্টাইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালার পাটনী মাঝি বড়ো শক্ত মাঝি, হাল চাপিয়া ধরে আর নৌকা ঠিক থাকে। ঝাপ্‌টা আসার পূর্বে মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটানো ও নামানো হইয়াছিল; সুতরাং পাল-সুদ্ধ নৌকা গুঁজড়াইয়া অতল জলে ডুবিবে সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝড়-ঝাপ্‌টা, ঝড়ের ধাক্কা, গোঁগোঁআনি এ-সকলের চেয়ে আর-এক ঘোর বিপদ আসিয়া পৌঁছিল, সে হইল সমুদ্রের ঢেউ। জোর বাতাসে ঢেউগুলি জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। সিকি মাইল, আধ মাইল এমন-কি এক মাইল লম্বা এক একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতে লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ঢেউএর উপর দিয়া গিয়া নৌকার ওপার গিয়া পড়িতে লাগিল। ঢেউএর মাঝখানে নৌকা পড়িলে, চড়ন্দারেরা 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে। সকলে ইষ্টদেবতার নাম করে; ভাবে আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত পরে, আবার ঢেউ সরিয়া গেলে, আবার তাহাদের মনটা একটু সুস্থ হয়। কিন্তু সে সুস্থভাব কতক্ষণ? আবার ঢেউ— আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি, বস্তা বস্তা তুলা—পিঁজা তুলা—

সমুদ্রের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাতাসে জল প্রথম ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে; দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফুলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো উঠিয়া পড়ে; তাহার পর সেই ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া ফেনা বাহির হয়। চড়ন্দারেরা মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে, 'তোরা আপনার দোষে আমাদের ডুবাইলি দেখিতেছি!' তাহারা মাঝিদের গালি পাড়ে। মাঝি-মাল্লারা প্রাণপণে নৌকারক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সেই ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের গলদ্‌ঘর্ম হইতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? তাহারাও গালি পাড়ে।

একজন বলিল, "বেটারা জানিস, এই সাঙ্ঘায় বিহারী দত্ত আছে? সে যদি ডুবে বাঙ্গালা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।"

তাহারা বলিল, "হাঁ হাঁ জানি; কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশী দরকারী। বিহারী মরিলে, তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারদের দেখিবার অনেক লোক হইবে। আমাদের স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার কে আছে বলো দেখি।"

আবার ঢেউ আসিল। সব ঝগড়া-বিবাদ, সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া গেল। আবার 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পড়িয়া গেল।

এ দিকে বিহারীর নৌকায় ঢেউ দেখিয়া মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁত-কপাটি লাগিয়াছে। বিহারীরা স্ত্রী-পুরুষে জলের ঝাপটা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রের গোঁগোঁআনি সহিতে পারিতেছে না, আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় বিহারীর স্ত্রীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল। মাঝিরা একখানা কাঠের সেঁউতি আগাইয়া দিল, বেনেবউ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না।

মেয়ের ও স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া বিহারী স্থির থাকিতে পারিল না। বার বার বড়ো মাঝিকে ডাকিতে লাগিল। মাঝি আসে না। সে বলে, "এখন আমি হাল ছাড়িলে রক্ষা থাকিবে না।"

তখন বিহারী পাগলের মতো হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, "আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের এই অবস্থা, আমায় রক্ষা করো।"

মাঝি বলিল, "মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি—কিন্তু, তাহাতে আপনার সাত-আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। সহিতে পারিবেন তো?— বলুন।"

বিহারী বলিল, "আমার যথাসর্বস্ব যায় সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।"

"আচ্ছা, তবে আপনি ঘরে যান, আমি যাহা জানি করিয়া ফেলি।" বলিয়া মাঝি আর-একজন মাঝিকে ডাকিয়া কী বলিয়া দিল। সে নৌকার খোলের ভিতর গেল, আর সমস্ত মাঝি-মাল্লা ডাকিয়া পঞ্চাশটা গর্জন-তেলের পীপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড় যখন খুব জোরে আসিতেছে, তখন সেই পীপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অনেক কষ্টের সংগ্রহ করা তেলের পীপাগুলি এইরূপে নষ্ট করায় বিহারীর মনে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তেল যতদূর যাইতে লাগিল, সমুদ্র স্থির হইতে লাগিল। বাতাসের যে জোর সেই জোরই রহিল, কিন্তু সমুদ্রে আর ঢেউ উঠে না। সমুদ্র দর্পণের মতো স্থির হইল; নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। বেনেবউ একটু সুস্থ হইল, তাহার বমি থামিয়া গেল। মেয়েও সুস্থ হইল; বেনেরও মনটা ঠাণ্ডা হইল, সে মাঝিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবে স্বীকার করিল। মাঝির উপর তাহার বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনও সমানে বহিতেছে। মাঝি দত্তমহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া

পাঠাইল। বেলা তখন দুপুর। বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর-পশ্চিম মুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে। মাঝি বলিল, "ঝড়ে আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় সাত-আট দিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্বেই হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহানায় গিয়া পৌঁছিব।"

# ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

## জগদীশচন্দ্র বসু

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরে এক সময়ে কূলপ্লাবন করিয়া জলস্রোত বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোটো ছোটো তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত, এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই-যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা-

আনয়ন-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত। তাহার পর, বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদী-তীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্বকথা শুনিতাম, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল ? যে যায়, সে তো আর ফিরে না ; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয় ? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি ? যে যায় সে কোথা যায় ? আমার প্রিয়জন আজ কোথায় ?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে !"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ নদী ?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি। বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সে শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া,

বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল-নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী ; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ-দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমার পথপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখো! জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্তপ্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীল স্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়— মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইঁহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া

মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।*

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, উহা অতীব দুর্গম ; দুইদিন চলিলে পর তুষারনদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূরপ্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গে ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা ; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

---

*কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষারশিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

তুষারনদীর উপর দিয়া উর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়াপ্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত উর্ধ্বে উঠিতেছি, বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। অবশেষে হতচেতন-প্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষারপর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহা উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে

পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয় -রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষারশয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষারশয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ ছিল না, পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল— উপত্যকা রচিত হইল। পর্বত-গাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে এক স্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমিপ্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ-সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরতা-শক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ-দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত

দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে। জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতিস্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার-রূপে প্রকাশ পাইতেছে ; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে ; ঊর্ধ্বভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা -বলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে ; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

এখনও ভাগীরথীতীরে বসিয়া তাহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না। 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—'মহাদেবের জটা হইতে'।

# স্বাদেশিকতা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল-প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প-ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লি-দরবার সম্বন্ধে একটি গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গভর্মেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূতপরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল; বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে

ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত; আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। এই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্‌-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয় তাহার সকল-প্রকার রাস্তা মারিয়া তাহার সকল-প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্য-ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গভর্মেণ্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত

ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসন-মাত্র অভিনয় করিতেছিল তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুর-মাত্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চ-নীচ-নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?" মালী তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন,

"আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চিৎকার-শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে, কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাত-নাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহু দূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড় বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের 'হরির লুঠ' ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খ্যাংরা কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায়, কিন্তু সে তেজে যাহা জলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স-কয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারত-সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান্ তাহা নহে—আমাদের একবাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত।

আরো-একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে, কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি

একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন', কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ড্‌সনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

# সাক্ষী

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।"

গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।"

রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।"

রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠা-মহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপকে কিছুতেই তিনি চাকরি করিতে দেন নাই এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম বুঝা দুঃসাধ্য।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল; বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজবউ, তোমার তো বুদ্ধি-নাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? দাদা গেলেন,

এখন আমি তো রহিয়া গেলাম। তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমত আমাকে বলিও, এখন ঠিক সময় নয়—"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে, এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।"

গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি। লোকে যদি তাহাকে ক্রীশ্চান বলিত সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'রাম, আমি যদি ক্রীশ্চান হই তো গোমাংস খাই'। জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে।

যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিও।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি -সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন; অবশেষে কাতর-স্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী? আমি তো দাদা নই।"

নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো-

মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না। দাদা বললেন, লেখো, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান।"

এ দিকে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছু দিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।"

নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক, নির্বোধ, কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছু দিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইল-জালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-এক জন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী, এবং সহি কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল; সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষী জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদিন না যাইতেই রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল

জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।”

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “তোরা এ কী সর্বনাশ করিয়াছিস!”

গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী! সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!”

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনও-বা তর্জনগর্জন কখনও-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্ককণ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ, কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন; বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতিধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, “হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যাহা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ

চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ হস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজ হস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।"

এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম!"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল। আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে! আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান্ বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

# তোতা-কাহিনী

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজ-হাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, "অল্প পুঁথির কর্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই।

মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল্, "উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তন্‌খা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি!"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের ; ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাখ-ঘণ্টা ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া তূরী-ভেরী-দামামা কাঁসি-বাঁশি-কাঁসর খোল-করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প।

পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারক-নবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন ?"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য ! শব্দ কম নয় !"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি ?"

রাজার চমক লাগিল ; বলিলেন, "ঐ যাঃ ! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই !"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না ; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কান-মলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মত আধ-মরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকাল বেলার

আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্ কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি!"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পূরা হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে?"

"না।"

"আর কি গান গায়?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।"

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্ খস্ গজ গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ-হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

## রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়; বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যা-শাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটি কঠোর-কঙ্কাল-বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙিতে পারিত, কেহ কখনও নোওয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকটবেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় ; আমাদের মতো দুর্বল লোকদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্যজাতি-সুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি-না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন।

যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল ; বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই, নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলাকে ছাঁটিয়া, দলিয়া, চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশ লাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্য মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে তাঁহার চরিত্রকে কোনোরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তৎপূর্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মাল-মসলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই।··· তিনি ঠিক যেমন বাঙালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালীটিই

ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ-দ্বারা পরত্ব-গ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। এমন-কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় সে-সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে-আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচার-বিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ ছিল যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন-কি তিনি হিতৈষণাবশে যে-সকল কাজ করিয়াছেন তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনোস্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব

দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না; লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোনো একটা-কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ-দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা বহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন-ব্যাপার বড়োই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান

অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তুচ্ছ গণনা করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণ-শোকে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথপ্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটি দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্বল মানুষের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়! ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সে গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটী-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

বঙ্গদেশের মধ্যে ছোটো-বড়ো এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোনো-না-কোনো প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর।

# ভরত

## দীনেশচন্দ্র সেন

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।"

ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন করিলে তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র ও স্বীয় ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। এমন নির্দোষ—শুধু নির্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণ-কাব্যে একমাত্র আদর্শচরিত্র—ভরতের ভাগ্যে যে কী বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই।... রামবনবাসোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও দুই-এক বার এই নির্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ রামের বনবাসকালে

"ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্ম শৌনিকে পশবো যথা"

"আমরা ঘাতকসন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম" এই বলিয়া আর্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালোবাসিতেন যে "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ" বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন, "ধর্মপ্রাণ

ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে আমার কোনো চিন্তার কারণ নাই।” অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই-একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিওনা—ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না।”…পিতা দশরথ রামাভিষেকের উদ্‌যোগের সময়ে ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছেন; “ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা ; কারণ, যদিও ভরত ধার্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ! ইক্ষ্বাকু-বংশের চিরাগত প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই প্রাপ্য; এমত অবস্থায় ধার্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্রমাহাত্ম্য এত বুঝিতেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনুমান্‌কে ভরতের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, “আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোনো বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিও।” এই সন্দেহও একান্ত অমার্জনীয়। জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মতো আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল।…

কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন ; এই-সকল বাক্যে, ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল বাহিনী-সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্ট কামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড়ধারণপূর্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন-কি ভরদ্বাজ ঋষি পর্যন্ত তাঁহাকে

ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোনো পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া তো যাইতেছেন না?" প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্তি বিষণ্ণতাপূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন। নর্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বন্ধুগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বাভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনোরূপেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল—

"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।"

কিন্তু গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মতো মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন।

বহু দেশ নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যে অযোধ্যার মতো বোধ হয় না—নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্যস্রোতে-প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদোদ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত। রাজপথ চন্দন ও জল -নিষেকে পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংযতকবাট ও

শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। এ তো অযোধ্যা নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।”

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। চাঁদের হাট ভাঙিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকমঞ্চে পাদোত্তোলনোদ্যত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়কঙ্কণ-কেয়ূর সখীগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনী-বেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্বভূষণ ধারণের যোগ্য সেই ‘সুবর্ণচ্ছবি’ লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। বিপণি বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা; পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক-ব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতে-ছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

“যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।”

“সর্বজীবে যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।” এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—

“ক স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।”

“অক্লিষ্টকর্মা পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?” বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মতো বোধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, “রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার

দাস, সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।” রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।…

শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী-কামনায় যে-সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া কৈকেয়ী পুত্রের প্রীতি-উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাদুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি— “তুমি ধার্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী॥ তুমি আমার ধর্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন করো।” যখন কাতর কণ্ঠে ভরত এই-সকল কথা বলিতেছেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন, “ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনো।” কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন— তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।” এই কটূক্তিতে মর্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না— বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে শোকে মুহ্যমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন— তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। শ্মশান-

ঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন ?"

অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন ; শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল ; ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন— "ইক্ষাকুবংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনাগীতি গাহিতেছ ?" রাজমৃত্যুর চতুর্দশ দিবসে বশিষ্ঠপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন, "রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।"

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেল এবং কৈকেয়ীকে তর্জন করিয়া অনুসরণ করিলে ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শৃঙ্গবের-পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম একটু জলপান করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহুপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছে— এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; গুহক কথা বলিতেছেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, রানীগণ এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞান লাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "এই নাকি তাঁহার শয্যা— যিনি আকাশ-

স্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত—যাঁহার গৃহ পুষ্পমাল্য চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত— যে গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও গীতবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারুকার্যের আদর্শ— সেই গৃহপতি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়াছিলেন, এ কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব ? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই। আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনযাপন করিব।"

এবার জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন। এই সর্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। এক রাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্রকূটাভিমুখে রওনা হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রানীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা দেবতার ন্যায় সৌম্যমূর্তি দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা ; উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্পকর্ণিকারতরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী, ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা ; আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা— এই দুর্ভাগার মাতা।" বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জল-ভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহের পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্তমূর্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন—“হেমচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন ? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু-দ্বারা মার্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর ! যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতি-পুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন ! আমার জন্যই তুমি এই-সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্ !” বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন-দৃশ্য বড়ো করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথায় জটাজূট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন ; বলিলেন, “বৎস, তোমার এ বেশ কেন ? তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।”

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন, “আমার জননী মহা-ঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন ; আমি আপনার ভাই, আপনার শিষ্য, দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন—আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।” বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল ; ভরত বলিলেন, “আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্তব্য।”কোনোরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশন-ব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন,

"রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিব।" অযোধ্যার সন্নিকটবর্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই ; আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কী বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাঁহারা সকলে কাষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কাষায়বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবৃত, ব্রত-অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ করো।" চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশি হইয়াছে।

রামায়ণে যদি কোনো চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোনো কোনো জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোনো খুঁত নাই। পাদুকার-উপর-হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কল-ধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।"

কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

# মন্ত্রশক্তি

## প্রমথ চৌধুরী

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না; কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র পড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কী দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পুব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ির দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত-দুপুরে পেত— ধোঁয়ার মতো যাঁর ধড়, আর কুয়াসার মতো যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পুজোর আঙিনা— যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল ব'লে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেন নি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দার, তার সৈন্যসামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কী চেহারা তার! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁফ ছাঁটা। সে ছিল ওদিকের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর পাটনিকে এক-হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি,— ও হাতে নিলে কোনো লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে ও 'না' বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি

লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস, চর্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক-হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাত-ব্যাবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মতো আমিও খেয়ার নৌকো পারাপার করেই দু-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠিখেলা নয়, লগিঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তা হলে তুমি লাঠি খেলতে জান না?"

সে উত্তর করলে, "হুজুর, জানতুম ছোকরা-বয়সে। তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি, লকড়িও ধরি নি, সড়কিও ধরি নি; তা ছাড়া আর-একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কী করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি নে, তবে— হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?"

ঈশ্বর বললে, "ছেলেবেলায় এরা-সব খেলা শিখত। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়স যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে— আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে, আমি কোনো মন্তর-তন্তর শিখেছি— তারই গুণে আমি সকলকে হটিয়ে দিই। হুজুর, আমি তন্তর-মন্তর কিছুই জানি নে, তবে আমার যা ছিল তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি-সড়কির মার কোন্ দিক থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারত না, আর শুধু মার খেত।

শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে। তার পর, একদিন এরা রাত-দুপুরে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে, আমাকে বিছানা থেকে তুলে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবার উদ্‌যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, 'তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করো যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব।' হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি এই দিব্যি করেছি; আর তার পর থেকে একদিনও লাঠি-সড়কি ছুঁই নি। কথা সত্যি কি মিথ্যে— ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।"

মিছু আমাদের বাড়ির লেঠেলদের সর্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে?"

সে 'হাঁ' 'না' কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলি নি— আর কখনো বলবও না।"

তার পর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মিছু যদি গুলিখোর হয় তো এমন পাকা লেঠেল হল কি ক'রে?"

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না?— ঠাকুরদাস কামার অত বড়ো মোষটার মাথা এক কোপে বেমালুম কাটলে, আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করি নে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন তো ক'মে এসেছে— যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয় তা হলে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।"

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম, তারা ঈশ্বরকে খেলবার

অনুমতি দেবে কি না। তারা পরস্পর পরামর্শ করে বললে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মতো অনুমতি দিচ্ছি। দেখা যাক, ও কী ছেলেখেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে বুকে বাঁধলে ; আর তার ঝাঁকড়া চুল একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘষে ফুলিয়ে তুললে, তার পর মাটিতে জোড়াসন হয়ে ব'সে পাঁচ মিনিট ধরে বিড় বিড় করে কী বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব এই বলে চীৎকার করে উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে— আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।"

ঈশ্বর এ-সব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না। তার পর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জলছে ও শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।

ঈশ্বর বললে,"প্রথম একহাত লকড়ি নিয়েই ছেলেখেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দার বললে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক-হাত খেলে তাকে যদি হারাতে পারো, তা হলে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কাকে বলে, তা দেখাব।"

তার পরে একটি বছর-কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতোই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি ; বাঁ হাতে ছোট্ট একটি বেতের ঢাল, আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে একখানি লকড়ি।

খেলা শুরু হল ; তার পর, এক মিনিটের মধ্যেই দেখি কামালের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লকড়ি হাতে ধ'রে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কী!"

এ কথা শুনে মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল।

ঈশ্বর বললে, "তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।"

এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে দুজনের লকড়ি বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি, মনিরুদ্দির সর্বাঙ্গে লাল লাল দাগ হয়ে গিয়েছে, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে বললে, "ধর্ বেটা সড়কি।"

ঈশ্বর বললে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিয়ো না। জানি, তুমি খুনে। কিন্তু এ তো কাজিয়ে নয়—আপসে খেলা। আর এই কথা মনে রেখো, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।"

এর পর সড়কির খেলা শুরু হল। সড়কির সাপের জিভের মতো ছোটো ছোটো ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কী রকম করে, কারণ সড়কির ফলা তো সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' ব'লে চীৎকার করে উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কব্জি থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে।

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা হলে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়— হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে গেল, আর

সমস্বরে 'মার বেটাকে' ব'লে চীৎকার ক'রে তারা বড়ো বড়ো লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড়ো লাঠি দু হাতে ধ'রে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দুজনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে, আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল। কারো কারো মাথাও ফেটে গিয়েছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারি নি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন— সে-সব ওদের লাঠিরই দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে এর লাঠি ওর মাথায় পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি-যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের— ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে।"

মিছু সর্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা জাদু জানে, এখন তো দেখলেন যে, আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে ?"

ঈশ্বর হাত জোড় করে বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। তবে লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কী যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই, যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম, লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই— যথা, সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে, তিনিই দিগ্বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কী, যাঁদের শরীরে তা নেই তাঁরা তা জানেন না, আর যাঁদের শরীরে আছে তাঁরাও জানেন না।

# ভাগ্যবিচার

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানে এক পাহাড়, তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু ; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকর যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যাপূজার জোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন ; মন্দির খালি।··· এক দিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল, আর-এক দিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া— তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ করে শব্দ করেই চুপ করলে। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপরে মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর-সন্ধ্যেয় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন, চার মূর্তি। সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার করে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না— তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘাড়টা নোয়ালেন, হাত-দুটো একটু কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল ; আর জয়মলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলে না, বসে বসেই বললে, “মাতাজি, গণনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা রয়েছে।” সিদ্ধিকরী কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালেই হাত বোলাতে লাগলেন, আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ

মুছতে থাকলেন ; দেখে পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, "ভাবেন কী? বড়ো জরুরী কথা। বেশ করে ভেবেচিন্তে গণনা করে উত্তর দেবেন।"...

সিদ্ধিকরী একবার চার জনের দিকে চেয়ে বললেন, "রাজকুমার, তোমরা নিজেই নিজেদের বিচার শেষ করে বসে আছ। সঙ্গ— যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে, উনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন— রাজ্যেশ্বর। সুরজমল বসেছেন মাটিতে— সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন— হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার। আর পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ— সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়— কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই।" এই কথা বলেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন ; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কট্‌মট্‌ করে এর ওর দিকে চাইতে থাকল। সব-প্রথম সুরজমল কথা বললেন— "তা হলে?" "তা হলে সিংহাসন কার এইখানেই স্থির হয়ে যাক আজই" বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাহিরে যাবেন, তলোয়ারের চোট পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘটল। সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক দিকে গেলেন সুরজমল ; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর-এক দিকে— এর পিছনে উনি, তাঁর পিছনে তিনি। অন্ধকার ঢেকে নিলে চার জনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় এক রাতের পথে রাঠোর-সর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরণে কাঁচা মাটির দেওয়াল-ঘেরা খামার বাড়ি।... রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ "রক্ষা করো" বলে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে

উঠলেন, "একি! এমন দশা আপনার কে করলে?" সঙ্গ দু কথায় তাকে বুঝিয়ে দিলেন— প্রাণসংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল দুজনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন, কিন্তু জয়মল এখনও পিছনে তাড়া করে আসছেন তাঁকে মারতে! বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, "রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।"...

সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখে অনেক দূরে ছোটো একটি কালো ফোঁটার মতো আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। সেই সময় তিন ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তেরাঙা হাতখানা দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন—তার পর ঘাড় নীচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এ দিকে সকাল হয়ে গেল, কোন্-এক অজানা গাঁয়ের কিষানরা সকালে ক্ষেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ। সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এ দিকে মহারানারও লোকজন— তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে, ঘোড়া পাল্‌কি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে; কিন্তু কেবল পৃথ্বারাজ সুরজমল দুজনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেলে, আর দুজন যে কোথায় তার খবরই হল না। পৃথ্বীরাজ রানীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন; সুরজমলের চোট বেশি, অনেক তদ্‌বিরে তিনি সুস্থ হলেন।

মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে

বললেন, "এই-যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না ; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথাও লুকিয়ে আছে। মনে কোরো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই যদি চাও তো বড়ো ভায়ের সঙ্গে না লড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করো গে, তবে বুঝব তুমি বীর— যাও।" ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, "তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই-জন্যে তোমাকে বেশি শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাকো, চিতোর-মুখো হোয়ো না।"

সুরজমল তো নির্বাসনে যান। এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিগ্‌বিজয়ে।...

রাজস্থানের মীনারা জংলী, দুর্দান্ত জাত ; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে ; নদালা ব'লে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী... নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করবার মতলব করলেন। আহেরিয়া-পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন ; সেইদিন চাকর মনিব সব এক হয়ে শিকার বনভোজন— এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়ো-বড়ো মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল-সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ ক'রে তাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে ছারখার ক'রে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকি রইল, বনে-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে।...

এ দিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে ঘুরতে বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে

সময়ে বেদনোরে টোডার রাজা, রায় শূরতান সিং, পাঠানদের উৎপাতে রাজ্যসম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমাসুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায়; কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা, পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন— ঘোড়ায় চ'ড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন— যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উল্‌টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী ক'রে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপি-চুপি শূরতানের অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন— ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে! বেশি দূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা প'ড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধ'রে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হল না, তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়নঘর থেকে একেবারে হাত ধ'রে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না, এক ঝাপটায় জয়মলকে দশ হাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একটি ছুরির ঘায়ে তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ ক'রে দিলেন। শূরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভুঁয়ে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমত। জয়মল মহারানার ছেলে, আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত; কাজেই চিতোরে যখন

এই খবর পৌঁছল তখন সবাই ভাবলে, এইবার শূরতান গেলেন! কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বললেন, "জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়; সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার! কোন্ বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও, শূরতানকে বলো গিয়ে— আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।"

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটো ভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেই দিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই— দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে সমানে মিলল। ইনি দেখলেন ওঁকে, উনি দেখলেন এঁকে! ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে! কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই। পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করেলেন,টোডা রাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই। আর সেইদিনই তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী, আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে।···সকাল বেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল করে নিলেন। পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল। এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বারাজ— ছেলের মতো ছেলে! মহারানা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় দুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পৃথ্বারাজ তখন অনেক দূরে — কমলমীরে; সওয়ার খবর নিয়ে সে দিকে ছুটল, মহারানা দল বল

নিয়ে চট্‌পট্‌ লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন।... চিতোরের খুব কাছে গাভিরী-নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেদিনের মতো স্থগিত রইল। দুই দলেই লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে দিকে মশাল আর ধুনি জলছে; সারা দিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘাগুলো ধুয়ে-পুঁছে পটি বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন—এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধ'রে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বললেন, "ভয় নেই; কেমন আছ তাই জানতে এলেম।" সুরজমল একটু হেসে বললেন, "হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছিলেম। যা হোক, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে খুশি হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর নি?" পৃথ্বীরাজও হেসে বললেন, "কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে আসছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি।" এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হল। সুরজমল বললেন, "আরে দেখছিস নে কে এসেছে! যা দৌড়ে, আর এক থাল নিয়ে আয়।" দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল বললেন, "বুঝেছি, সারংদেব এই এক থালা বই আর কিছু পাঠায় নি।" "খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাবে।"—ব'লেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা—গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল! বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বললেন, "আমাদের পুরোনো ঝগড়াটা

তা হলে আজ তোলা থাক্, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কী বল?” সুরজমল হেসে বললেন, “বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব জেনো।”

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন— একটার পর একটা পরগনা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল করে নিলেন ··· সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে দেউলগড়ে সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে মরবার সময় পেলেন ; তাঁর কপালের লিখন এমনি করে ফলল।

জয়মল, সুরজমল, দুজনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে সরে পড়লেন ; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে— সঙ্গ বেঁচে আছেন, শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদ্‌যোগ হচ্ছে।··· সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্য বার হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটোবোন এক পত্র পাঠালেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাথি মারছে, ঘরের বার করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট, এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না দিলে তাঁর ছোটোবোন মারা যাবে। ছোটবোনের কান্না-ভরা সেই চিঠি প'ড়ে পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরে, বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে, কিন্তু যাওয়া হল না— পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহির মুখে, বোনকে রক্ষে করতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক থেকে ঠিক উল্টো মুখে— অনেক দূরে!

রাতের অন্ধকারে শয়ন-ঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহির রাজা

ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহির রাজাটাকে ভুঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রানার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরে বললেন, "দাদা, থামো, প্রাণে মেরো না।" পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, "এত বড়ো ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে! জানে না, তুই মহারানার মেয়ে! ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে করতে হয়।" শিরোহির তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বললে, "এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা করো।" পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, "নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা— তবে রক্ষে পাবি।" "এ কথা আগে বললেই হ'ত" বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রানী বললেন, "থাক্, এবার এই পর্যন্ত। যাও, এখন দাদাকে জল-টল খাইয়ে ঠাণ্ডা করো গে, আমায় একটু ঘুমোতে দাও।" রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহির খাসা নাড়ু গুটিকতক জল খেতে দিলেন। শিরোহির খাসা নাড়ু, অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না; শিরোহির মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচুরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল —জুতো-তোলার শোধ নিতে।

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন— রাস্তার ধুলোয়! কমলমীর— যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন সেই দিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল··· আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবতখানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে— ভোর ভয়ি! ভোর ভয়ি!

# নতুন-দা

## শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব একপশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায় শীতটা যেন ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধিতেছিল আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারি দিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, "—তে থিয়েটার হবে, যাবি ?" থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, "তবে কাপড় প'রে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ি আয়।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে— তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, "তা নয় আমরা ডিঙিতে যাব।" আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়তো-বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, "ভয় নেই ; জোর হাওয়া আছে, দেরি হবে না। আমার নতুন-দা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।"

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া, ঠিক হইয়া বসিয়াছি— অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুন-দা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু, অর্থাৎ ভয়ংকর বাবু। সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্প্‌-শু, আগাগোড়া ওভার্‌কোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি— পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া, ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া,

আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

"তোর নাম কী রে?"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "শ্রীকান্ত।"

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত! নে, তামাক সাজ্। ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে— তামাক সাজুক!"

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও তো এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর্, আমি তামাক সাজ্‌চি।"

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাসতুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল.এ. পাস করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কী রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কী শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্‌চে— পেতে দে দেখি, বসি।"

"আমি দিচ্ছি নতুন-দা। আমার শীত করচে না—এই নাও" বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়— আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল!

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, "নতুন-দা, এ যে ভারি মুশকিল হল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না।"

নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।"

কলিকাতাবাসী নতুন-দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দাঁড়! কারুর সাধ্য নেই নতুন-দা, এই রেত ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নতুন-দা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, "তবে আনলি কেন হতভাগা? যেমন ক'রে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধরেচে।"

ইন্দ্র কহিল, "তাদের বাজাবার লোক আছে নতুন-দা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।"

"না! আটকাবে না! এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম! চল্, যেমন করে পারিস্ নিয়ে চল্।" বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইঁহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম— কিন্তু, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রের অবস্থাসংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, "ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?" কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁতমুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। বলিলেন, "তবে যাও-না, টানোগে-না হে। জানোয়ারের মতো ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?"

তার পরে একবার ইন্দ্র একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো-বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া কখনো-বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে

বলায় জবাব দিলেন, "আমি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারব না।"

ইন্দ্র বলিতে গেল, "না খুলে—"

"হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি ক'রে ফেলি আর কি! নে—যা করচিস্ কর্।"

বস্তুত আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই-বা ছোটো ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে এক ফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভার্‌কোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে কোনোরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ— গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এ দিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে— থিয়েটারে পোঁছিতে রাত্রি দুটো বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এ দিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?"

ইন্দ্র কহিল, "সামনেই একটা বেশ বড়ো বস্তি নতুন-দা। সব জিনিস পাওয়া যায়।"

"তবে লাগা লাগা। ওরে ছোঁড়া— ঐঃ— টান্-না একটু জোরে— ভাত খাস নে? ইন্দ্র, বল্-না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।"

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, "হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার।" অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম,এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও তো নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁহার একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেই ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, "চলো-না নতুন-দা, একলা তোমার ভয় করবে— আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না, চলো।"

নতুন-দা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন,"ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করি নে, তা জানিস? কিন্তু, তা ব'লে ছোটোলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাই নে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।"

তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়— আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি। কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজি হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাত-তালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন—'ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা—'

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকীসুরে সংগীতচর্চা শুনিতে-শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনেমনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, "এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মতো সহ্য করতে পারে না— বুঝলি না শ্রীকান্ত?"

আমি বলিলাম, "হুঁ।"

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়— বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই— দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি.এ. পাস করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কী করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোনো কালে নয়। অথচ ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিস-থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট দোকান-পত্র সমস্ত ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুড়ির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সে কথা যাহার জানা নাই তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়,

বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়; সুতরাং ঘুমাইতে জানে! দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথবধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"নতুন-দা!" কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ হুড়ারের জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, "বাঘে নিলে না তো রে!"

ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সেকি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড়ো অভিশাপ তো দিই নাই।

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপর কী-একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প্-শু'র একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—"শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না।" তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট

হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিলাম তখন এই দিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্তচীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিল তাহা জলের মতো চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশে-পাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যাব।" আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম— "পাগল হয়েছ ভাই!" ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড়ো ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, "তুই থাক্ শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস্— আমি চললুম।"

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনোমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না— সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত তাহাকে আমিই-বা কেমন করিয়া, কী বলিয়া বাধা দিব? যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায় তখন আর থাকিতে পারিলাম না— আমিও যা হোক একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "তুই ক্ষেপেচিস্, শ্রীকান্ত? তোর দোষ কী? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া

পড়িল। কোনোমতে গোপন করিয়া বলিলাম, "তোমারই-বা দোষ কী, ইন্দ্র? তুমি-বা কেন যাবে?"

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুন-দাকে আনতে চাই নি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।"

কিন্তু আমারও তো যাওয়া চাই। কারণ, পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, "বালির উপর দৌড়ানো যায় না— খবরদার, সে চেষ্টা করিস নে— জলে গিয়ে পড়বি।"

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, এক-পাল কুকুর ছাড়া, বাঘ তো দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কী-একটা কালো-পানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "নতুন-দা!"

নতুন-দা এক-গলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, "এই-যে আমি!"

দুজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প্-শু, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি— ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই-যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব,

সেই সংগীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাতে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়া প্রথম কথা কহিলেন, "আমার এক-পাটি পাম্প-শু ?"

"সেটা ওখানে পড়িয়া আছে" সংবাদ দিতেই তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য, একে একে পুনঃ পুনঃ শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন— কেন আমরা নির্বোধের মতো সে-সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম, না খুলিলে তো ধুলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার শামিল, আমরা এ-সব কখনো চক্ষে দেখি নাই— এই-সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ যে আসল বস্তুকে কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই-সব লোকের সংসর্গে না আসিলে এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মূর্ছিত হইতেছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে, 'পা মুছিতেও ঘৃণা হয়,' তাহা পুনঃ পুনঃ শুনাইতে শুনাইতে, ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হউক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা-চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁট মাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

# কৌরবসভায় কৃষ্ণ

## রাজশেখর বসু

নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত নয়। দুর্যোধনাদি আপনার পুত্রগণ অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞান-শূন্য ও লোভী, এঁরা ধর্ম ও অর্থ পরিহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছা করিলেই এই বিপদ নিবারিত হ'তে পারে। মহারাজ, যদি পুত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্নবান হন তবে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হবে।

পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না। যে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি আছেন সেই পক্ষে যদি পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন্ দুর্বুদ্ধি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হ'লে আপনি অজেয় ও পৃথিবীর অধিপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার কী সুখ হবে বলুন। পৃথিবীর সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, এই প্রজা-বর্গকে আপনি ত্রাণ করুন, আপনি প্রকৃতিস্থ হ'লে এরা জীবিত থাকবে। এরা নিরপরাধ, দাতা, লজ্জাশীল, সজ্জন, সদ্‌বংশীয় এবং পরস্পরের সুহৃৎ— আপনি মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন। এই রাজারা, যারা উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে এখানে সমবেত হয়েছেন, এঁরা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ ক'রে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই বর্ধিত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন— আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখভোগ করেছি, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নি। আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের সৎপথে আনুন, নিজেও সৎপথে থাকুন। পাণ্ডবেরা এই সভাসদ্‌গণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এঁরা ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদ্‌গণও বিনষ্ট হন।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যে সকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলুন আমার বাক্য ধর্মসঙ্গত ও অর্থকর কি না! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র,

আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশত্রু ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহের পর তিনি আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলেন। আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করেছিলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্যূতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছিলেন। সে অবস্থাতেও এবং দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, পাণ্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত ; আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।”...

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসংগত ও ন্যায্য। কিন্তু বৎস, আমি স্বাধীন নই, দুরাত্মা পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতির কথাও দুর্যোধন শোনে না। তুমিই ওই দুর্বুদ্ধিকে বোঝাবার চেষ্টা কর।

কৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার জন্ম ; তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। তুমি পিতামাতার বশবর্তী হও। যে লোক শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্‌গণের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে হীন মন্ত্রণাদাতাদের মতে চলে সে ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে আসছ, কিন্তু তাঁরা তা সয়েছেন। পাণ্ডবেরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, কর্ণ দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি ঐশ্বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন না। খাণ্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ প্রভৃতিকে জয় করেছিলেন, কোন্ মানুষ তাঁর সমকক্ষ ? শুনেছি বিরাট-নগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধই আমার উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ। যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন,

আমি যার সঙ্গে থাকব, সেই অর্জুনকে তুমি জয় করবার আশা কর? রাজা দুর্যোধন, কৌরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন তোমাকে নষ্ট কীর্তি কুলঘ্ন না বলে। পাণ্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে এবং ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধরাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা অতিশয় মঙ্গলজনক, তাতে অলব্ধ বিষয়ের লাভ হবে, লব্ধ বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যদি, এঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভীষ্ম ও দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই শত্রুতার অবসান হ'ক। তুমি নতমস্তকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর, তিনি তাঁর সুলক্ষণ দক্ষিণ বাহু তোমার স্কন্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন; ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজারা সকলে আনন্দাশ্রু মোচন করুন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না ক'রে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়া ভালোবাসেন সেজন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় করেছিলেন তাতে আমার কি দোষ? বিজিত ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাতেও আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে কি জন্য তাঁরা কৌরবদের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বিনষ্ট করতে চান? উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমরা ইন্দ্রের কাছেও নত হব না। পাণ্ডবদের কথা দূরে থাক্‌, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণকে পরাস্ত করতে

পারেন না। আমরা শত্রুর নিকট নত না হয়ে যদি যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করি তবে বন্ধুগণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশব, পূর্বে আমার পিতা পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা তা পাবেন না। যখন আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের বশে পিতা যা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয় তাও আমি ছাড়ব না।

ক্রোধচঞ্চল নয়নে হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনির সঙ্গে দ্যূতসভার আয়োজন করেছিলে। তুমি ভিন্ন আর কে ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে নির্যাতন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দুঃশাসন অনার্যের ন্যায় বহু নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে। বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে তুমি দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে। সর্বদাই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার ক'রে আসছ, তবে তুমি অপরাধী নও কেন। তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও? পাপাত্মা, ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে।

দুঃশাসন দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে দেবেন। এই কথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভা থেকে উঠে চ'লে গেলেন; তাঁর ভ্রাতারা মন্ত্রীরা এবং অনুগত রাজারাও তাঁর অনুসরণ করলেন।

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বিদুরকে বললেন, দূরদর্শিনী গান্ধারীকে এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গে দুর্যোধনকে অনুনয় করব। গান্ধারী এলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার দুরাত্মা অবাধ্য পুত্র

প্রভুত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই হারাচ্ছে, সুহৃদ্‌গণের উপদেশ না শুনে সে অশিষ্টের ন্যায় সভা থেকে চ'লে গেছে।

গান্ধারী বললেন, অশিষ্ট অবিনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নয়, তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মূঢ় দুরাত্মা লোভী কুসঙ্গী পুত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দুর্যোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। গান্ধারী বললেন, পুত্র, তোমার পিতা ও ভীষ্মদ্রোণাদি সুহৃদ্‌বর্গের কথা রাখ। রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব, দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কেউ তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগণ ঐক্যবদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বীর, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'লে তুমি সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভীষ্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সত্য, কৃষ্ণার্জুন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হলে তিনি উভয় পক্ষের মঙ্গল করবেন। যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তের বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মূঢ়, তুমি মনে কর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি তোমার জন্য যুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান অধিকার, দুই পক্ষের সঙ্গেই এঁদের সমান স্নেহসম্বন্ধ, কিন্তু পাণ্ডবরা অধিকতর ধর্মশীল। ভীষ্মাদি তোমার অন্নে পালিত সেজন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে শত্রুরূপে দেখতে পারবেন না। বৎস, কেবল লোভ করলে সম্পত্তিলাভ হয় না। লোভ ত্যাগ কর, শান্ত হও।

মাতার কথায় অনাদর দেখিয়ে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনের কাছে গেলেন।

# লুই পাস্তুর

১৮২২-১৮৯৫

## চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জোসেফ মিস্টার নামে একটি ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, পথে একটা পাগলা কুকুর তাকে কামড়াল। মিস্টারের দেহ ক্ষতবিক্ষত হল। পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়, আর তাতে মৃত্যু অনিবার্য। ছেলেটি যে ডাক্তারের কাছে গেল সৌভাগ্যক্রমে তিনি লুই পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। ভদ্রলোক অবিলম্বে ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠালেন। ঠিক সে সময় পাস্তুর জলাতঙ্ক-রোগ-নিবারণের এক সিরাম তৈরি করেছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কার উপর ওটা প্রয়োগ করবেন। মিস্টার আসাতে সুবিধা হয়ে গেল, দিনের পর দিন পাস্তুর তাকে ইন্‌জেক্‌শন দিতে থাকলেন, ছেলেটির জলাতঙ্ক-রোগ দেখা দিল না।

সংবাদটা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্স নয়, ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জলাতঙ্ক-রোগী প্রতিষেধক সিরাম ইন্‌জেক্‌শন নেবার জন্যে পাস্তুরের পরীক্ষাগারে আসতে লাগল। দূরদেশ থেকে আসার অসুবিধা দূর করতে পাস্তুর তাঁর প্রণালী-মতে চিকিৎসার বিভিন্ন কেন্দ্র পৃথিবীর বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে সাহায্য করলেন, জলাতঙ্ক-রোগের মৃত্যু থেকে লোক রক্ষা পেল। আজ পৃথিবী থেকে ও-রোগ চলে গেছে বললেই হয়। কিন্তু এ হল পাস্তুরের পরিণত বয়সের আবিষ্কার।

লুই পাস্তুর ১৮২২ সালে ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার চামড়ার ব্যাবসা ছিল, কিন্তু তাঁর অভিলাষ ছিল পুত্র ভালো রকম লেখা-

পড়া শিখে ভবিষ্যতে কোনো কলেজের অধ্যাপক হয়। এর জন্য গোড়া থেকে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা করলেন, ফ্রান্সের সব চেয়ে ভালো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছেলেকে পাঠালেন। রসায়নবিদ্যা ছিল লুইএর সব চেয়ে প্রিয় বিষয়, দিন রাত তিনি সে-সম্বন্ধে অনুশীলন করে চললেন। তাঁর পিতার আনন্দের অবধি রইল না যখন কয়েকটি মৌলিক গবেষণার জন্য পাস্তুর ডক্টর উপাধি লাভ করলেন।

পাউসেট নামে একজন বিজ্ঞানী একটা পরীক্ষা করলেন। তিনি একটা ফ্লাস্ক্ ফুটন্ত জলে পূর্ণ করে মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করলেন। এবার ফ্লাস্ক্‌টা উল্টে ধরলেন। একটা পাত্রে পারা ছিল, মুখটা পারার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ছিপিটা খুলে সরিয়ে নিলেন। এইবার তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে অক্সিজেন তৈরি করে ওই ফ্লাস্কের মধ্যে চালিয়ে দিলেন, কিছু জল বেরিয়ে এল। শেষে তিনি গরম চিম্‌টে দিয়ে ধরে একটা খড়ের টুক্‌রো এই ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এখন ফ্লাস্কের মধ্যে রইল বিশুদ্ধ অক্সিজেন, ফোটানো জল, আর জীবাণুশূন্য খড়। কোনো রকমে কোনো পথ দিয়ে ওর ভিতর জীবাণু ঢুকতে পারে না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল যে, ফ্লাস্কের জলটা ঘোলাটে হয়েছে। অণুবীক্ষণে ওই জলে বহু জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই পরীক্ষা থেকে পাউসেট ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয় লোকের এ ধারণা ভুল, ওই ফ্লাস্কের জীবাণুরা আপনা হতে জন্মাল।

পাস্তুর এ-সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে সুনিশ্চিত হলেন যে, পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল ; তিনি বহু লোকের সম্মুখে পাউসেটের পরীক্ষাটা করলেন। ঘর অন্ধকার করে পাত্রস্থিত পারার উপর উজ্জ্বল আলো ফেললেন, দেখালেন যে, পারার উপর বহু ধূলিকণা রয়েছে। তিনি বললেন যে, ওইসব ধূলিকণাতে জীবাণু আছে, আর যখন ফ্লাস্কের মধ্যে খড় দেওয়া হল তখন ওই খড়ের সঙ্গে অনেক জীবাণু ভিতরে চলে গেল। তিনি দেখালেন যে,

ধুলাতে সব সময় জীবাণু থাকে। তিনি বললেন যে, বায়ুতে জীবাণু রয়েছে, কোথাও বেশি কোথাও কম। বদ্ধ শয়ন ঘরে জীবাণুরা সংখ্যায় বেশি, পর্বতের উপরকার বায়ুতে খুবই কম। বহু পরীক্ষা থেকে তিনি এ-সব সিদ্ধান্তে এলেন।

একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পাস্তরের সাক্ষাৎ হল, সে লোকটি বিট থেকে কোহল তৈরি করত। লোকটি জানাল যে, তার প্রস্তুত কোহল শীগগির খারাপ হয়ে যায়। এখন, কোহল যে শুধু বিট থেকেই হয় তা নয়, নানা রকম ফল বার্লি প্রভৃতি যে-সব জিনিসে চিনি আছে তা থেকেও কোহল প্রস্তুত করা যেতে পারে। পাস্তর দেখলেন যে, চিনির গেঁজে-ওঠাই হল কোহল তৈরির মূলকথা, আর চিনিকে গাঁজিয়ে তোলে জীবাণু। দুধ যে টকে যায়, মাখনের উপর যে ছাতা পড়ে, এ সবার মূলে হল ওই একই ব্যাপার। তিনি দেখলেন যে, লম্বাটে ধরণের এক রকমের জীবাণু কোহলকে খারাপ করে। তিনি সে-রকমের জীবাণু-বিনাশের ব্যবস্থা করলেন, কোহল আর খারাপ হল না।

সেই সময় ফ্রান্সে গুটিপোকা-চাষের খুব চলন ছিল। দক্ষিণ-ফ্রান্সের অধিবাসীরা এই ব্যবসায়ে ও রেশমের জিনিস তৈরির কাজে তাদের জীবিকা অর্জন করত। ১৮৬৫ সালে ওই গুটিপোকার মড়ক লাগল, রেশমের ব্যাবসা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার মতো হল। পাস্তরের উপর ভার পড়ল এর প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করার। এই ব্যবস্থায় গুটিপোকার চাষিরা দুঃখিত হল প্রাণিতত্ত্ববিশারদদের যে কাজ তার ভার দেওয়া হল কিনা একজন রসায়নবিদ্‌কে! পাস্তর পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, দেখলেন যে এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু এই উৎপাত ঘটায়। তিনি তাদের চিনলেন, চাষীদের চেনালেন, প্রতিষেধের ব্যবস্থা করলেন; মড়ক থেমে গেল, ফ্রান্সের জাতীয় ব্যাবসা পুনরুজ্জীবিত হল। তাই তো টমাস হক্সলি বলেছিলেন, ১৮৭০ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সকে যে পরিমাণ

খেসারত দিতে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা ফ্রান্সের ঘরে এল পাস্তরের এক আবিষ্কার থেকে।

অ্যানথ্রাক্স-রোগে প্রতি বছর অনেক জন্তু-জানোয়ার মারা যেত। পাস্তরের জীবাণু সম্বন্ধে আবিষ্কারের পর কখ্‌ নামে একজন বিজ্ঞানী অ্যানথ্রাক্স-রোগে মৃত একটি পশুর রক্তে এক বিশিষ্ট রকমের জীবাণু লক্ষ্য করলেন। তিনি সেই জীবাণু ইঁদুর খরগোসের গায়ে ইন্‌জেকৃশন করলেন, তাদেরও ওই রোগ দেখা দিল। এখন পাস্তর এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, মৃদু রকমের এই জীবাণু যদি কোনো পশুর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে তার তখন ওই রোগ খুব স্বল্পভাবে দেখা দেবে, কিন্তু ভবিষ্যতে ওই রোগের মারাত্মক আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পাবে। পশুশাস্ত্রবিদেরা পাস্তরের কথা উপহাস করে উড়িয়ে দিল, শেষে তারা পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণ করবার জন্য পাস্তরকে আহ্বান করল। পাস্তর সম্মত হলেন। ১৮৮১ সালের ২রা জুন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, প্রচলিত সংস্কার বা পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত, কিসের জয় হবে! পাস্তরের মতের পক্ষের ও বিপক্ষের বহু লোক সমবেত হয়েছেন। প্রাণিবিদ্যার, চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা এসেছেন, বহু সাংবাদিক উপস্থিত। এর আগে পাস্তরকে পঞ্চাশটি সুস্থ ভেড়া দেওয়া হয়েছিল. তাদের পঁচিশটিকে তিনি মৃদু টিকা দিয়েছেন, বাকি পঁচিশটির কিছুই করেন নি। এর কিছু দিন পরে পঞ্চাশটি ভেড়াকে তিনি তীব্র অ্যানথ্রাক্স-জীবাণু ইন্‌জেকশন করেছেন। ওই দিন বেলা দুটোর সময় পাস্তর জনমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হলেন। ভেড়াগুলি পর পর রাখা হয়েছে। দেখা গেল, আগে টিকা দেওয়া হয় নি এমন পঁচিশটির মধ্যে বাইশটি মৃত, তিনটি যায়-যায় অবস্থায়; আর টিকা দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। বিপুল হর্ষের মধ্যে জনমণ্ডলী পাস্তরের জয়ধ্বনি করল।

এর পর পাস্তর জলাতঙ্ক-রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি

নির্ণয় করলেন। শুধু এই আবিষ্কারটির জন্যই তিনি সমগ্র জগদ্‌বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

পাস্তুর কোনোদিন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন নি, কিন্তু তিনিই বহু ব্যাধির কারণ নির্ণয় করলেন আর জগদ্‌বাসীকে তার দূরীকরণের উপায় জানিয়ে গেলেন। ফরাসী দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে, এ-সম্বন্ধে সেই সময় একবার ভোট নেওয়া হয়েছিল। বহুসংখ্যক লোক ভোট দিয়েছিল। গণনায় দেখা গেল, পাস্তুর প্রথম, নেপোলিয়ান দ্বিতীয়, ও ভিক্‌টর হুগো তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

কিন্তু, কি অমায়িক ছিলেন এই জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী! ১৮৮২ সালে লণ্ডন শহরে চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় এক সর্বদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ফ্রান্স পাস্তুরকে তার প্রতিনিধি করে পাঠাল। অধিবেশন আরম্ভ হবে, সকলে খবর নিচ্ছে পাস্তুর এসে পৌঁছেছেন কি না। হল লোকে লোকারণ্য। দর্শকমণ্ডলীর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাস্তুর প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুত্র ও জামাতা। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে তিনি তাঁদের বললেন, বোধ হয় প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের আগমনে এই জয়ধ্বনি, আমাদের আগে আসা উচিত ছিল। কংগ্রেসের সভাপতি পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন, না, দর্শকমণ্ডলী আপনাকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে।

১৮৯৫ সালে ২৮এ সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মৃত্যু হয়। তাঁর নামে যে গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেইখানেই তাঁর সমাধি রক্ষিত আছে। এই গবেষণাকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে— একটা কুকুর এক মেষপালক বালককে আক্রমণ করছে, ছেলেটি বাধা দিচ্ছে।

আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জন বিজ্ঞানীর নাম করা হয়, তবে নিশ্চয়ই পাস্তুরের নাম তার মধ্যে থাকবে। আর সমগ্র মানবজাতির সব চেয়ে বেশি কল্যাণ সাধন করেছে কে, এ প্রশ্নের উত্তরে পাস্তুরের কথাই বলতে হবে।

# স্বাধীনতালাভের পরে

## শ্রীকালিদাস রায়

মুক্তি-সংগ্রামের অবসান হইয়াছে। স্বাধীনতা পাইয়া অনেকে নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের কর্তব্যেরও বুঝি শেষ হইয়াছে, এখন দেশের সুশাসনের জন্য কেবল দেশনেতারা ও কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন। কিন্তু সত্যই কি সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হইয়াছে? কোনো বস্তু হস্তগত হইলেই সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত হয় না, তাহাকে রীতিমত আত্মসাৎ করা বা জীবনের অঙ্গীভূত করার নামই আসল প্রাপ্তি। খাদ্যবস্তু হাতে পাওয়া, তাহার স্বাদ গ্রহণ করা, এমন-কি,গলাধঃকরণ করাও জীবদেহের পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়, তাহাকে পরিপাক করিয়া অঙ্গীভূত করাই পরম প্রাপ্তি।

বাহিরের সংগ্রামের অবসানে জাতীয় সংগ্রাম সমাপ্ত হয় নাই। এখন ভিতরের সংগ্রাম অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্ববিধ দুর্বলতা, শৈথিল্য, মূঢ়তা, ভ্রান্তসংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। স্বাধীনতাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিবার জন্য, তাহাকে পূর্ণরূপে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য, স্বাধীনতার দায়িত্বভারবহনে যোগ্যতা অর্জনের জন্য জাতিকে দেহে মনে সবল সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্র-সমরের পরে যুধিষ্ঠির যখন বহুপ্রাণহানিজনিত পাপের চিন্তায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অনেকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন, 'ধর্মরাজ, বাহিরের শত্রুর নিপাত হইয়াছে, এখন তোমাকে ভিতরের শত্রু—নির্বেদ, মোহ, দৈন্য, ভ্রান্তসংস্কার ও অহংবুদ্ধির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, 'কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। ধর্মরাজ্যসংস্থাপন করিয়া তাহার

রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই।' গণতন্ত্র-শাসনে রাজার ইদানীন্তন অনুকল্প সমগ্র জাতির উদ্দেশেই এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তি প্রযোজ্য।

মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ সব্যসাচী নেতৃগণ এক হাতে জাতিগঠন অন্য হাতে জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন। জাতিগঠনের ব্রত উদ্‌যাপনের আগেই ঘটনাচক্রের উদ্‌বর্তনে স্বাধীনতা আসিয়া পড়িল। ফলে,জাতি-গঠনের ব্রত অসমাপ্ত হইয়া আছে, সেজন্য রাহুগ্রাস হইতে জাতির পূর্ণ মুক্তি হয় নাই। এখনো আমাদের রাহুগ্রাসজনিত অশৌচের অন্ত হয় নাই। জাতি যদি সুস্থ সবল হইয়া গড়িয়া না উঠে তবে আমাদের স্বাধীনতা হইবে শরদভ্রচ্ছায়া অথবা সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ।

মনে রাখিতে হইবে—আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রীয় শাসন গণতন্ত্রীয়। আমরা এখন গাণপত্য, অর্থাৎ জনগণই আমাদের অধিপতি ও আমাদের ভাগ্যবিধাতা। জনগণের প্রতিনিধিরা এখন এই রাষ্ট্রের শাসক। জাতি যদি প্রকৃতিস্থ, শৃঙ্খলানিষ্ঠ ও সবলচিত্ত হইয়া না উঠে, তবে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গও তদনুরূপই হইবে। সিজু গাছে কখনও কি চাঁপা-ফুল ফুটে? পদ্মরাগের আকরে যেমন কাচ জন্মে না, তেমনি কাচের আকরেও পদ্মরাগ জন্মে না। অতএব সুশাসন লাভ করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের অবিলম্বে প্রয়োজন।

এজন্য আগে জাতিকে গণতন্ত্রীয় মনোভাবে আবিষ্ট হইতে হইবে। বহুশতবর্ষ যে জাতি পরাধীনতার অন্ধকারে আবদ্ধ ছিল তাহাকে ক্রমে স্বাধীনতার আলোকে অভ্যস্ত হইতে হইবে। গণতন্ত্রীয় শাসনবিধানে জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি-নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে প্রতি-নিধিনির্বাচনের (ভোটের) অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই অধিকার পণ্ডিত জওহরলালের যতটুকু, তাঁহার নিম্নতম ভৃত্যেরও ততটুকু। এই অধিকারের মূল্য মর্যাদা ও দায়িত্ব যে কত তাহা উপলব্ধি করা প্রত্যেক

দেশবাসীর কর্তব্য। এইখানেই তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এত বড়ে মর্যাদা কোনো দিন কি দেশবাসী পাইয়াছিল ? এই মর্যাদার অপব্যবহার করার মতন মূঢ়তা আর নাই। কোনো ক্ষেত্রে, কোনো প্রয়োজনে, কোনো প্রকার দুর্বলতায়, কোনো বাহ্য প্রভাবে, কোনো ভয়ে বা ভরসায় এই অধিকারের যেন অপচার না হয়— ইহাই আদর্শ গণতন্ত্রীয় বিধানের প্রধান কথা। দরিদ্র হউক, মূর্খ হউক, জাতিকুলে নিম্নস্তরের মানুষ হউক, প্রত্যেকেই সমান অধিকারে সম্মানিত সজাতি ও আপন জন, ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রীয় মনোভাব।

ভেদবুদ্ধিতে মোহাচ্ছন্ন দেশে এই মনোভাব সহজে আসিবার কথা নয়, তবু 'মানুষের প্রাণের ঠাকুর' সকলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান, এই আধ্যাত্মিক ধর্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত আবেদন কি ব্যর্থ হইবে ?

দেশের সমস্ত আইনকেই নিজেদের রচিত আইন মনে করিয়া নির্বিচারে মানিয়া চলিতে হইবে। ব্যক্তিগত দাবী সংবরণ করিয়া নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের বশ্যতাই আসল গণতন্ত্রীয় ধর্ম। কেবল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান নয়, যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের বিধি নিষেধ সম্পূর্ণ জানিয়া বুঝিয়া, তাহার অধীনতায় থাকিয়া বা আসিয়া, সেগুলিকে না মানার মনোভাব গণতন্ত্রবিরোধী।

সভ্যদেশে যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে পরাজয় ঘটিলে সংখ্যা-গরিষ্ঠের বিজয়কে যথাযোগ্য বলিয়া নতশিরে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে, বিজয়ী পক্ষ বিরোধী পক্ষের প্রতি কোনোরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। প্রতিপক্ষ যে প্রায় সমকক্ষ তাহা ভুলিলে চলিবে না।

মানসিংহ যত বড়ো বীরই হউন, পরাজিত ঈসা খাঁ যে তাঁহার সমকক্ষ তাহা তিনি ভুলেন নাই।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগী অমিত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ফলাফল-প্রকাশের পর তাহাকে দেশসেবায় মিত্র ও সহযোগী বলিয়াই স্বীকার করাই সুসংগত।

সমাজের বা জাতির যাহাতে মঙ্গল হয় এমন-সকল কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সঙ্গে সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি পরস্পর বিবাদবিসংবাদ করিত— কিন্তু যখন সমগ্র দেশ বহিরাক্রমণে বিপন্ন হইত তখন তাহারা দ্বেষাদ্বেষি ভুলিয়া দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিত। আমাদের হয়তো এখন বাহিরের শত্রু নাই। কিন্তু ভিতরে অন্নকষ্ট, অজ্ঞতা, ব্যাধির প্রকোপ, ভ্রান্তসংস্কার ইত্যাদি সাধারণ শত্রুর তো অভাব নাই। এই-সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রাচীন গ্রীসের আদর্শই অনুসরণীয়।

প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, জাতে জাতে, ধর্মে ধর্মে, এমন-কি জেলায় জেলায়, ভেদাত্মিকা বুদ্ধির প্রবলতাই আমাদের দেশকে চিরদিন হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। এই ভেদাত্মিকা বুদ্ধিকেই বাহন করিয়া সবল ইংরেজ ধীরে ধীরে এই অবল দেশকে কবলিত করিয়াছিল, আবার ইহাকেই আসন করিয়া তাহারা সারা দেশ শাসন করিতেছিল। এই ভেদবুদ্ধি বিদূরিত না হইলে জাতীয় সংহতির কোনো আশা নাই। এই সংহতির দৃঢ়ভিত্তিতেই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা চাই। ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে-গড়া তাজমহলও এত কাল স্থায়ী হইত না।

গণতন্ত্রের উপযোগী করিয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে জাতীয়তা-বোধের উদ্‌বোধন করা চাই। কতকগুলি দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ও দেশনেতাদের উদাত্ত আহ্বান সাময়িকভাবে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বাধীনতালাভের পর একটা নিশ্চিন্ত ভাবের উদয়ে এবং স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষের ফলে তাহা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয়তাবোধের অর্থ ইংরাজবিদ্বেষও নয়— জাতির অতীত গৌরবের

স্বপ্ন দেখাও নয়। আমাদের দেশের সাহিত্যে তাহার আতিশয্যই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, গভীর ঘুমের আয়োজন,
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা আর নাহি তাহে প্রয়োজন।

বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে।" স্বদেশভূমি যদি মা'ই হন তবে দেশবাসী মাত্রই ভাই। অতএব—জাতীয়তাবোধের তাৎপর্য— জাতির সকল মানুষকে ভাইবোন মনে করিয়া তাহাদের যাহাতে ইষ্ট হয় তাহাই করার প্রবৃত্তি এবং যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহা হইতে নিবৃত্তি।

পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি পথের দুই ধারের বাড়ির মাটির প্রাচীর রাস্তার দিকে আগাইতে আগাইতে ত্রিশ বৎসরে রাস্তাকে এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিয়াছে। যে পুষ্করিণীর জল সারা গ্রামের লোক পান করে, লোকে তাহার জল নানাভাবে দূষিত করিতেছে। ট্রেনে উঠিয়া দেখি—কামরার ভিতরটা খাবারের ঠোঙা, চীনাবাদামের খোলা থুতুশ্লেষ্মায় অপরিচ্ছন্ন। এই সমস্ত জাতীয়তাবোধ-হীনতার নিদর্শন। প্লাটফর্মে ও শহরের ফুটপাতে ফলের খোসা ছড়ানো—জাতীয়তাবোধ না থাকায় লোকে ভাবিয়াও দেখে না ইহা কত বিপজ্জনক। সংক্রামক ব্যাধি লইয়া অনেকে রোগবিষ ছড়াইয়া পথে বাজারে যানে জনতায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘরে আবদ্ধ থাকা যে ইহাদের পক্ষেও মঙ্গল, জনসাধারণের পক্ষেও মঙ্গল— এ কথা ইহারা বুঝে না।

শহরে দেখা যায়, দেওয়ালী বা কালীপূজা, হোলী, সার্বজনীন পূজার প্রতিমাবিসর্জন ইত্যাদি উপলক্ষে উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে লোকের কী অসুবিধারই না সৃষ্টি হয়। লাউডস্পীকারগুলি গানকে বাণে পরিণত করিয়া আমাদের কানকে নির্মমভাবে বিদ্ধ করে। রাস্তায় ছুঁড়িয়া-ফেলা

নোংরা জিনিসের জন্য বহু পথেই প্রাতঃকালে হাঁটিতে হইলে গঙ্গাস্নান করিয়া বাটিতে ফিরিতে হয়। ভাঙা কাচের জিনিস রাস্তায় পড়িয়া থাকে, খালি পায়ে অনেক মানুষই যে চলে তাহা পার্শ্ববর্তী পাদুকায়ুধ গৃহস্থদের বিবেচনার অতীত। ট্রেন, ট্রাম, বাসের উঠানামায় পথরোধের ফলে আরোহীদের কী বিপন্নই না হইতে হয়! লাইব্রেরী হইতে বই আনিয়া কেহ কেহ প্রয়োজনমত মূল্যবান বইয়ের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া লয়। বইএর অযত্নের তো কথাই নাই, বইগুলিকে বার বারই তাই হাসপাতালে পাঠাইতে হয়। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, গ্রামে বরযাত্রী আসিলে বিয়ে-বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করিয়া চলিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে তাহাদের কীর্তির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। সেই বরযাত্রীয় মনোভাব এখনও অনেক ছেলের আছে। তাই স্কুলের হাইবেঞ্চিগুলিকে অক্ষত দেখা যায় না, সেগুলিতে ছাত্র-বীরগণ অস্ত্রাঘাতে নিজেদের নাম অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। দেখা যায় স্কুলকলেজের সাদা দেওয়ালে দোয়াতের কালী কিংবা পানের পিচ ছড়ানো বা ছিটানো—অথবা পেনসিলের লিখনে তাহা শ্রীহীন ও অপরিচ্ছন্ন। পরীক্ষার ফলের প্রাচীরপত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিগুলিকে কাচের আবরণের মধ্যে না রাখিলে চলে না।

ছেলেদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। খাদ্য ও ঔষধে ব্যবসায়ীদের ভেজাল দেওয়ার মতো জাতীয়তাবিরোধী অপকর্ম আর কিছুই নয়।

জাতির অনিষ্ট করার প্রবৃত্তিই যদি দূরীভূত না হয়, ইষ্ট করার শুভ ইচ্ছা কী করিয়া জন্মিবে?

কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষ হইতে বিচার করিলেই জাতির ইষ্টানিষ্ট বিচার করা চলে না। 'জাতির, দেশের বা সমাজের যদি মঙ্গল হয় তবে আমার স্বার্থহানি হয় হউক'— অম্লানবদনে এই কথা বলিতে পারাই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ।

জাতীয়তাবোধের সহিত জাতীয়স্বাতন্ত্র্যবোধের গভীর সম্পর্ক। প্রধানতঃ জাতীয়সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাই জাতীয়স্বাতন্ত্র্যবোধ। সভ্য স্বাধীন জাতি মাত্রই সগৌরবে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। কেবল রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাই পূরা স্বাধীনতা নয়। নিজেদের সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অধিগত হয়। অহিতকর আচার ও কুসংস্কার অবশ্যই দূর করিতে হইবে, কিন্তু অকারণে, কেবলমাত্র পরজাতির অনুকরণে স্বজাতির ভাষা, ভূষা, আচার, আচরণ, অনুষ্ঠানাদি বর্জন কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রকৃতিস্থ জাতির লক্ষণ নয়। পরগাছার কোনো বৃক্ষগৌরব থাকিতে পারে না। নদী হইতে কাটা খালও নদীগৌরব লাভ করে না।

জাতীয় জীবনে সব চেয়ে বড়ো কথা শৃঙ্খলাবোধ। ঐতিহাসিকগণ বলেন— এই দেশ যে বার বার বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে পরাভূত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ, তাহাদের অল্পসংখ্যক সেনার মধ্যে সামরিক শৃঙ্খলার সুব্যবস্থা, আর আমাদের বহুসংখ্যক সেনার মধ্যে তাহার শোচনীয় অভাব। কবিগুরু বলিয়াছেন, "সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে। জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন।" সামরিক শৃঙ্খলা না থাকিলে সৈন্যসমাবেশ জনতায় পরিণত হয়। শৃঙ্খলার অভাবেই যুগে যুগে আমাদের হাতে পায়ে নব নব শৃঙ্খল।

ইউরোপীয়েরা যে সারা জগতে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, তাহাদের জাতীয় জীবনে অবিচলিত বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা। তাহাদের নিম্নতম বিদ্যালয় হইতে শৃঙ্খলারক্ষা সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা করা হয়, কেবল পাঠের বেলাতে নয়, মাঠের খেলাতেও। তাহার উপরে আছে ভজনালয়ের শৃঙ্খলা ( church discipline )। কেবল ভজনালয়ে নয়, তাহাদের ভোজনালয়েও শৃঙ্খলা— সমাজে, সংসারে, হাসপাতালে, হাটে

মাঠে, শবযাত্রায়, সর্বত্রই শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। সামরিক শৃঙ্খলার তো কথাই নাই। ফলে, পাশ্চাত্য দেশে শৃঙ্খলার এমন একটা আবেষ্টনী ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়াছে যে পৃথক্ করিয়া সেখানকার নরনারীকে এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয় না,— শৃঙ্খলা-শ্রীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে জন্ম ও প্রতিপালনই যথেষ্ট। শৃঙ্খলাকে তাহারা শৃঙ্খল মনে করে না— কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতোই শৃঙ্খলা তাহাদের জীবনের অঙ্গীভূত এবং সহজাত।

আর আমাদের সামাজিক জীবনে, গৃহসংসারে, বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে, আফিসে, আদালতে, সভাসমিতিতে, তীর্থমন্দিরে, যানবাহনে, বাজার-হাটে, খেলার মাঠে সর্বত্রই শৃঙ্খলার অভাব। রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক হইলে রোগীর ঘর অবাঞ্ছিত লোকে ভরিয়া যায়। এমন-কি আমাদের শ্মশানযাত্রাতেও শৃঙ্খলা নাই। সভা-সমিতিতে এত গোল হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে সভার কার্য চালানোই কঠিন হয়, নাচ-গানের দ্বারা গোল থামাইতে হয়। শ্রাদ্ধসভায় কীর্তন হয়, কিন্তু শ্রোতারা সেখানে আপন আপন আফিস, আদালত, ব্যাবসা-বাণিজ্যেরই গল্প করে এবং তাহাদের সিগারেটের ধূমরাশি ধূপধূমের গন্ধকে বিলুপ্ত করে। শৃঙ্খলার অভাবে আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অকালমৃত্যু হয়। আরোহীরা বিশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া ট্রামে বাসে এত দুর্ঘটনা ঘটে। শৃঙ্খলার অভাবেই আমাদের অনেক সময় অযথা অর্থদণ্ড দিতে হয়। শৃঙ্খলার অভাবে কেবল ভোজবাড়িতে নয়, রোজ বাড়িতেও খাদ্যাদির অপচয় ঘটে। সুশৃঙ্খল গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক সংসারে দারিদ্র্য। যে-সব বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সন্ধান লইয়া দেখা গিয়াছে সেগুলিতে বিশেষ প্রয়াসের দ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। পাঠনাকক্ষে শৃঙ্খলা না থাকিলে মহামহোপাধ্যায়দের পাঠনাও সাফল্য লাভ করে না। বালকবালিকাদের আদর্শ গণতন্ত্রীয় নাগরিক-রূপে

গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেক গৃহে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাশ্রী সঞ্চার করিতে হইবে।

শৃঙ্খলাই শ্রী। শৃঙ্খলাই আমাদের প্রসুপ্ত সৌন্দর্যবোধকে প্রবুদ্ধ করে। শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইলে জীবদেহের একটা খণ্ডিত অংশের মতোই অনেক বস্তুই কদর্য। একজন পথচারী মাতাল সামাজিক শৃঙ্খলা হইতে ভ্রষ্ট বলিয়াই অসুন্দর। অশিষ্ট আচরণ, প্রগল্‌ভতা, বাচালতা, প্রমত্ততা, আস্ফালন, চীৎকার করিয়া অথবা অঙ্গভঙ্গী করিয়া কথা বলা, কদর্য-বাক্য উচ্চারণ, ক্রোধবশে মুখশ্রী বিকৃত করা বা হস্তপদসঞ্চালন, পরিচ্ছন্নকে অপরিচ্ছন্ন করা, দরিদ্র সমাজে অতিরিক্ত বিলাসিতা বা ঐশ্বর্য প্রদর্শন ইত্যাদি অশোভন ও অসুন্দর বলিয়া সভ্য সমাজে বর্জনীয়। এই সমস্ত ঘটে শৃঙ্খলাশ্রীজাত সৌন্দর্যবোধের অভাবে।

শৃঙ্খলাবোধ হইতে কেবল নিয়মানুবর্তিতা নয়, সময়ানুবর্তিতা জন্মে। ইহার অভাবেই কর্মস্থানে ও বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতিতে বিলম্ব ঘটে, ট্রেন ফেল হয়, সভার কার্য যথাসময়ে আরব্ধ হয় না। অপরের সহিত সাক্ষাতে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া যায়। যে প্রয়াসের দূর ভবিষ্যতে ফল ফলে, যথাকালে তাহার বীজবপনে যে শৈথিল্য, তাহার আর ক্ষতিপূরণ হয় না। ইহার অভাবে ব্যক্তির এবং সমাজের কত যে অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়, কত সুযোগ সুবিধা, কত মাহেন্দ্রযোগ যে হেলায় হারাইতে হয়; তাহার ইয়ত্তা নাই। সময়নিষ্ঠতার অভাবের মধ্যে আমরা 'হায় হায়' ধ্বনি শুনিতে পাই! তবু আমাদের শিক্ষা হয় না। দেশে সময়ানুবর্তিতার আদর্শ যে নাই তাহা নহে। রেডিও স্টেশন, পরীক্ষার হল্ ও ট্রেনের যাতায়াতের সময়নিষ্ঠতা এ বিষয়ে সকলের আদর্শ হওয়া উচিত।

শৃঙ্খলা সকল রীতিনীতিকে শাসন করে কিন্তু স্মৃতির দাসত্ব করে। যাহাতে শৃঙ্খলা নাই তাহা আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি না। শৃঙ্খলা সম্বন্ধে শেষ কথা এই বলা যায়, সমগ্র বিশ্ব— এই সৌরজগৎ— এই সৃষ্টির

ধর্মই অবিচলিত অক্ষুণ্ণ শৃঙ্খলা। মানুষের ধর্মও ইহাই হওয়া উচিত। মানবধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়াও ইহার অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। মনে রাখিতে হইবে, বিনয় ( discipline ) দান করে বলিয়াই বিদ্যার সার্থকতা। এই বিনয়ই পাত্রতা অর্থাৎ যোগ্যতা নির্দেশ করে।

বিষয়ান্তরের প্রলোভনে বিক্ষিপ্তচিত্ত না হইয়া জ্ঞানতৃষ্ণার প্রেরণায় দূর ভবিষ্যৎ ও উচ্চ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে ক্রীড়াভূমির ও ব্যায়ামাগারের বিধিবিধান পালনের দ্বারাই ছাত্রের আদর্শ চরিত্র গঠিত হইতে পারে। বিদ্যালয়কে আশ্রম এবং এইভাবে বিদ্যানুশীলনকে একপ্রকার তপস্যাই মনে করিতে হইবে। এই তপস্যার অন্যান্য ফলের মধ্যে চরিত্রবল-লাভই প্রধান। প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র ও ধনীর সন্তানদেরও গুরুর আশ্রমে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার শাসনে নানাবিধ দৈহিক শ্রমের সহিত অনাড়ম্বর নির্বিলাস জীবনযাপন করিয়া বিদ্যানুশীলন করিতে হইত। তাহাতেই তাহাদের চরিত্রও গঠিত হইত। এই শিক্ষাধারার অনুকল্পই হওয়া উচিত এ যুগের স্কুল-কলেজের শিক্ষাধারা।

উপাদান, উপকরণ ও পরিবেষ্টনীর পার্থক্য থাকিলেও মূলনীতির ও আদর্শের ব্যত্যয় হওয়া উচিত নয়। এই শিক্ষাধারার অন্যথা হইলে চরিত্রের শুচিতা, দৃঢ়তা বা সবলতা জন্মিতে পারে না। ফলে, পরবর্তী কালে কি জাতীয় জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য-পালনে, কি বৈতনিক কি অবৈতনিক কর্মে, কি রচনায় কি রসনায় স্খলন ও শৈথিল্য ঘটিবেই।

শিথিল মেরুদণ্ডের ও দুর্বল চরিত্রের নরনারীর দ্বারা গঠিত জাতি তদনুরূপই হইবে— তাহার শাসন, পালন, পরিচালনাও শিথিল ও দুর্বল হইবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

সভ্যদেশের বীরপুরুষরা যে দুর্গম প্রদেশে অভিযান করে, অনাবিষ্কৃত

ভূখণ্ডে যে অভিযাত্রী হয়— তাহা কোনো বৈষয়িক লাভের জন্যও নয়, নূতন রাজ্য অধিকারের জন্যও নয়, তাহা দুর্জয়কে জয় করিবার দুর্বার উৎসাহে ও বেগবান্ পৌরুষ-চৈতন্যের প্রেরণায়। এই পৌরুষ-চৈতন্য যাহাদের জীবনে প্রবুদ্ধ, তাহারা অসহায়, বিপন্ন ও দুর্বলের জন্য যে জীবন বিপন্ন করে তাহা শুধু করুণাবশে নয়, তাহা তাহাদের পৌরুষাভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য। খেলার মাঠেই তাহাদের পৌরুষ-সচেতনতার প্রথম সঞ্চার হয়। তাই ইহাকে বলে sportsmanlike spirit, ওয়াটার্লু-বিজয়ী ডিউক অব ওয়েলিংটন তাই বলিয়াছিলেন, The battle of Waterloo was won on the playing-field of Eton! আমরা ইহাকে ক্ষাত্র মনোভাব বলিতে পারি।

এই পৌরুষ-চৈতন্য বা ক্ষাত্র মনোভাব কখনও এ দেশে ছিল না বা কাহারও নাই তাহা বলিতেছি না। এই পৌরুষ-চৈতন্য যাহার আছে সে কোনো দৈহিক শ্রমকে হীন মনে করে না, দীনদুর্বলের সেবাকে কখনও মানহানিকর মনে করে না। প্যারিসের পথে এক বৃদ্ধ একটি ভারী মোট মাথায় তুলিতে পারিতেছিল না, সে অনেককেই অনুরোধ করিল সাহায্য করিবার জন্য, সকলেই তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেল। সেই পথে সম্রাট নেপোলিয়ন পদব্রজে চলিতেছিলেন, তিনি নিজ হাতে বৃদ্ধের মোট তুলিয়া দিলেন।

আমাদের রাজা রামমোহন একবার এইরূপ এক মুটের মাথায় মাল তুলিয়া দিয়াছিলেন বৌবাজারের পথে। বিদ্যাসাগরের তো কথাই নাই —তাঁহার ব্রতই ছিল দীনদুঃস্থকে সব সময়েই সহায়তা করা। কথিত আছে, তিনি একজন বিলাসী যুবককে শিক্ষা দিবার জন্য একবার কুলীর কাজই করিয়াছিলেন। রাস্তার রোগীকে কোলে তুলিয়া বাড়িতে লইয়া গিয়া তিনি সেবা করিতেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট লী-সাহেব একবার কান্দী যাওয়ার পথে

কতকগুলি পরিশ্রান্ত কৃষকের কোদাল লইয়া আধঘণ্টা মাটি কাটিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপ আচরণ কেবল লোকশিক্ষার (গীতায় যাহাকে লোকসংগ্রহ বলা হইয়াছে) জন্য নয়— ইহা পৌরুষ-চৈতন্যের অভিব্যক্তি। এই পৌরুষ-চৈতন্য যাহার প্রবুদ্ধ, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, ন্যায়ের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করে, অল্পে ধৈর্য হারায় না, নীরবে কাজ করে, কাজের চেয়ে কথাকে বড়ো মনে করে না, কোনো কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হয় না, সকলকে পথ ছাড়িয়া দেয়, দুর্বলকে ঠেলিয়া আগে যায় না, কেবল পথ দুর্গম বা বিপৎসঙ্কুল হইলেই সে সকলের আগে আগে যায়।

নবলব্ধ স্বাধীনতার দায়িত্ববোধ যদি শৃঙ্খলানিষ্ঠতা, জাতীয়তাবোধ, পৌরুষ-চৈতন্য ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগায় তাহা হইলেই জাতীয় জীবন নৈতিক বলে বলীয়ান হইবে— আইনের বিধিনিষেধ জাতির নৈতিক জীবন গড়িতে পারিবে না। নবযুগের তরুণ-তরুণীদের উপরই জাতীয় জীবনের সংস্কার ও শ্রীসঞ্চার নির্ভর করিতেছে। স্বাধীনতালাভের পর অনেক পতিত ও জংলা জমির উদ্ধার হইয়াছে— সে-সব জমি শস্য-শ্যামলও হইয়াছে। দেশের এই মানব-জমিনই কি আগাছায় ভরিয়া থাকিবে? প্রত্যাশা করা যায়, এই মানব-জমিন পতিত থাকিবে না, ইহার আবাদও হইবে এবং সোনাও ফলিবে। আশা করা যায়, দামোদরের দুর্দম জলপ্রবাহ যেমন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া কল্যাণপ্রদ হইয়াছে, দেশের প্রকৃতিস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে কল্লোলিত বিক্ষুব্ধ জনপ্রবাহ তেমনি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া কল্যাণাভিমুখী হইবে।

দামোদরের জলধারা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইয়া যেমন দেশের সমৃদ্ধিবর্ধনে নিয়োজিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন জনধারা হইতেও অনুরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্‌গত হইয়া জাতির আভ্যন্তরিক কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত হইবে। নিদ্রাভঙ্গের পর চোখে নিদ্রার আবেশ

কিছুক্ষণ থাকিয়া যায়— সেই নিদ্রা যদি দীর্ঘকালের হয় তবে সে আবেশ কাটিতে কিছু বিলম্বই ঘটে, হতাশ হইবার কারণ নাই।

# ভারতবর্ষ

## এস্. ওয়াজেদ আলি

পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটেছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হ'ত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে ব'সে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চারপাশে তার ধপ্‌ধপে সাদা চুল; নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা; গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক-এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে, গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করত। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালিগায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হ'ত, বিষয়টি তারা বিশেষ-ভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হ'ল। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী ক'রে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে

উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তখন কেউ-না-কেউ এসে আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই-বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পারি নি।

দু-চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তার পর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল! তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম! এমন কত শত জিনিস রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বাড়ি সব বদ্‌লে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যান্‌শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু-চারটে রিক্‌শ আর ঘোড়ার গাড়িই সে পথ দিয়ে যেত ; এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিটমিট ক'রে গ্যাসের বাতি জলত ; এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি!

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে! পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর ব'সে, মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোকটির মতোই একটি মধ্যবয়স্ক লোক

এক-এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যক-মত খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে বসেছিল সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

কোনো মায়ামন্ত্র-বলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি! আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা— পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম!

আমি আর থাকতে পারলুম না ; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়ে নি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয় নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভালো করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলে ; তার পর বিস্ময়ের স্বরে বললে, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম, "আজ্ঞে হাঁ।" বৃদ্ধ বললে, "তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা-মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ঐ বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর এই মেয়েদুটি আমার নাতনি— আমার ঐ ছেলের সন্তান।"

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, "এ বইটি কবেকার?"

স্মিত আস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার

ঠাকুরদাদা বটতলায় এটি কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা: আমার তখন জন্ম হয় নি।"

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হল, আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি! প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।— সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি।

# রুপো কাকা

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাস্টারের কাছে পড়তে। আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হ'ল— কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ি এলেন মরেলডাঙা কাছারি থেকে, আমরা সব ভাই-বোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্য কী কী আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে পা দিতেই রুপো কাকা আমাদের ব'কে উঠল, অ্যাঃ, রাজপুৎতুর-সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায়! বলি, ক'রে খাবা কি ভাবে? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা?

বাবা বাড়ি থাকতেও কি রুপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে? দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে, রাতে ঘুম হয় নি, রুপো কাকা।

—কেন রে?

—ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে।

—যা যা, তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রুপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ির গোমস্তা

কি নায়েব নয়, এমন-কি রুপো কাকা হিন্দু পর্যন্ত নয়। রুপো কাকা আমাদের কৃষাণমাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়। সে জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেছি রুপো কাকা নাকি সাজিমাটির নৌকোতে চ'ড়ে ওর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ-দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনি নি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েছে।

রুপো কাকা আমাদের বাড়ির কৃষাণগিরি করছে আজ ন'-দশ বছর। আমাদের ও জন্মাতে দেখেছে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য কথা নয়, আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে ক'রে মানুষ করেছে। অথচ রুপো কাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো ব'লে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্তী গাড়ু হাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সায়েবের ঘাটে কই মাছ কিনবার জন্যে। রুপো কাকা সাজিমাটির নৌকোতে ব'সে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে-সব অনেক দিনের কথা। রুপো কাকার বয়স এখন কত তা জানি নে, মোটের উপর বুড়ো। ঠাকুরদাদা মারা যখন যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়স। বাবাকে তিনি নায়েবের পদে বহাল ক'রে গেলেন জমিদারবাবুকে ব'লে-ক'য়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারিতে। আর বাড়িতে বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনো, প্রজা খাতকপত্র এ-সব দেখাশুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিন টাকা মাইনের কৃষাণ রুপো কাকার উপর।

আমাদের অবস্থা ভালো গ্রামের মধ্যে, এ-কথা সবার মুখেতে শুনে এসেছি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড়ো বড়ো চার-পাঁচটা ধানের গোলা, এক-একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্বদা আসছে খাজনা দিতে।

এ-সব দেখাশুনো করে কে ?

রুপো কাকা সব দেখাশুনো করত। আশ্চর্যের কথা, বাবা বিশ্বাস ক'রে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এত-সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবাকে সবাই দারুণ ভয় ক'রে চলত, মুখের উপর কথা বলতে সাহস করত না কেউ। কিন্তু রুপো কাকা বাবাকে বলত, বলি ওবাবু, তুমি যে এসো বাড়িতি ন'-মাস ছ-মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বলো তো। আদায়-পত্তর এবছর কিছু হ'ল নি। হাতীর পাঁচ-পা দেখেছ নাকি ? এত বড়ো সংসারডা চলবে কিসি ?

বাবা ছ্মাস অন্তর দু-তিন দিনের জন্যে বাড়ি আসেন। বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রুপো কাকা ধান পাড়ত, কলাই মুগ পাড়ত। খাতকদের কর্জ দিত। নিজের দরকার হ'লে নিজেও নিত। আমরা সব ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝি নে। ঠাকুরমা প্রবীণা বটে কিন্তু ভালোমানুষ, বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই। সে-অবস্থায় সব-কিছুর ভার ছিল রুপো কাকার উপর।

বাবা বাড়ি এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে। বলতেন, কে কী নিয়েছে রুপো ?

রুপো কাকা বলত, লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজ মুগ, বাড়ি ছ কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েছে? আচ্ছা লেখো, বীরু মণ্ডল দু বিশ ধান, বাড়ি পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েছে ?

—হয়েছে।

—রুপো এক বিশ ধান, দু কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েছে?

—হয়েছে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, বাড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি শেখ ধান এগারো কাঠা, বাড়ি সাত কাঠা।— এইভাবে রুপো কাকা অনর্গল ব'লে চলেছে গত দু মাসের মধ্যে কর্জ দিয়েছে যাকে যতটা জিনিস। ওর সমস্ত মুখস্থ, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির থোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে ক'রে রেখে দিয়েছে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

রুপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়িতে আসে নি দু-তিন দিন। এমন সময় বাবা বাড়ি এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রুপোকে ডেকে পাঠালেন। রুপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বলো গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারছি নে। এখন যেতি পারব না— জ্বরে মরছি। তা সীতেনাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেত?

বাবা বাবু-মানুষ। নতুন বাবু, রুপো-বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা বাঁ-হাতে নিয়ে; ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝক্‌মকে আংটি। প্রজা-পত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোক ফিরে এসে এ কথা বললে, তখন বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না ব'লে গুম হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ-ছয় পরে রুপো কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ি এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া সুরে ব'লে উঠলেন, রুপো!

—কী ?

—তুমি মনে মনে কী ভেবেছ জিগ্যেস করি ? তোমার এতবড়ো আস্পর্ধা, তুমি বল আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ি যাব! তুমি জান কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ ? তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তা হ'লে খোঁজ হয় না, তুমি জান ? এত বড়োলোক তুমি হ'লে কবে ?

রুপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে, তা তুমি মাথা কাটবা না ? এখন কাটবা বৈকি ! এখন তুমি বড়ো হয়েছ, বাবু হয়েছ, সীতেবাবু ! এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না ! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোরে যে কোলে ক'রে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে ? বড্ড গুণবন্ত হয়েছিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—

'তুমি' ছেড়ে রুপো কাকা, সামান্য সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্মচারী হয়ে মনিবকে 'তুই' ব'লেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বললেন, যা যা, বকিস নে—

—না বকব না ! তুই বড্ড তালেবর হয়েছিস আজকাল, বড্ড বাবু হয়েছিস ! তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে !— ব'লেই রুপো কাকা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ির মধ্যে। রুপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বললেন, তা ব'লে আমায় ও-রকম বলে কেন ?

ঠাকুরমা বললেন, তুই কাকে কী বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই ? তুই কি ক্ষেপলি ?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ির মধ্যে উঠে এলেন, তার পর রুপো কাকার কাছে এসে হাত ধরে বললেন, রুপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েছে, বড্ড ভুল হয়েছে।

রুপো কাকার রাগ কমে না ; বললে, না, আমার দরকার নেই

কাজে। ঢের হয়েছে। নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে। মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতি পারব না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝানো হ'ল; রুপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির থোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বললেন, বেশ, তা হ'লে আমি বাড়ি ছেড়ে যাই। রইল গোলা-পালা প্রজা-পত্তর। আমি কাল সকালের গাড়িতেই বেরুচ্ছি—

রুপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে, তুই চ'লে যাবি, তা তোর কাচ্চা-বাচ্চা মানুষ করবে কেডা?

—কেন, তুমি!

—মোর দায় পড়েছে। তোরে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করলাম ব'লে কি তোর ছেলেপিলেও কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করব! মুই কি আর জোয়ান আছি? বুড়ো হইছি না? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না, আমি আর থাকব না। কালই যাব চলে।

—কোথায় যাবি?

—মরেলডাঙা চ'লে যাব। ঠিক বলছি যাব। আমার বড্ড কষ্ট হয়েছে রুপোদা, তুমি আমায় এমন ক'রে বললে শেষকালে? আমি গৃহত্যাগী হব, হব, হব।—

বলেই বাবা ফেললেন কেঁদে।

রুপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধ'রে বললে, কাঁদিস নে সীতেনাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ! মুই আর তোরে কী বললাম। তুইই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি— কাঁদিস নে—

শেষে দু জনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম দুই বড়ো লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুই-এর গুঁতো মেরে মুখে হাত চেপে

হি হি ক'রে হেসে উঠল। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হলেন না। রুপো কাকাও চাকরি ছাড়লে না।

রুপো কাকা রাত্রে চৌকিদারি করত। অনেক রাতে আমাদের বাড়ি এসে ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলত, ওঠো বৌমা, জাগন থাকো, রাত খারাপ।

চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসী ঘোষ ও হীরু মাস্টার শুয়ে থাকত, তাদের জাগিয়ে দিয়ে বলত, একেবারে অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারি ধারে বেড়িয়ে এসো না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাস্টার দেখেছে। আমাদের কাছে গল্প করেছে সকালবেলা।

সব গ্রামে ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারী পোশাক প'রে লাঠিহাতে রুপো কাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পৈঁঠার উপর ব'সে থাকত।

এক-একদিন হীরু মাস্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করত, কে ব'সে?

—মুই রুপো।

—ব'সে কেন? এত রাতে?

তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্ছ, তোমাদের আর কী। গোলার ধান যাবে, সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কী জানবা! মোর ওপর ঝক্কি কত! মোর তো তোমাদের মতো ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াব! এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হব। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাস্টার বলে, ঘুমোও গে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মতো নিশ্চিন্দি হ'তে পারি নে তার কী হবে। ধানগুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে ব'সে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখছি নে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয় নি। বৃদ্ধবয়সে তিন দিনের জ্বরে রুপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চ'লে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সবসুদ্ধ ত্রিশ-বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ি।

বাবার সঙ্গে গিয়ে আমরাও দেখতে পেলাম রুপো কাকাকে। রুপো কাকার ছোটো চালাঘর। এক দিকে ডোবা, এক দিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে, শীর্ণ, শাদা-দাড়ি, রুপো কাকা পুরানো মাদুরে শুয়ে। রুপো কাকার ছেলের নাম বেজা, সে আমাদের দেখে বললে, আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে! জ্ঞান নেই, ভুল বকছে—

বাবা ওর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, ও রুপোদা! কেমন আছ, ও রুপোদা—

রুপো কাকা চোখ মেলে বললে, কেডা? সীতেনাথ? কবে এলে?

—এই পরশু এসেছি।

—বেশ করেছ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুড়ি ধান নিইচি চার কাঠা; আহাদ মণ্ডল কলাই দু কাঠা, বাড়ি দু কাঠা; বিষ্টু ধেরিসি ছ কাঠা ধান, বাড়ি চার কাঠা। মোর ধান পোষ মাসের ইদিকি দিতে পারব না ব'লে দিচ্ছি— ভুলে যাব, লিখে রাখো—

এই রুপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোনো কথা বলে নি রুপো কাকা। সেদিন সন্ধ্যেবেলা রুপো কাকা আমাদের গোলা-পালার দায়িত্ব চিরদিনের মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল।

বিশ্বস্ত লোকদের জন্যে কি কোনো স্বর্গ আছে? যদি থাকে আমাদের বাল্যের রুপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এ-সব। এই-সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে-কথার দিনে, বড্ড বেশি ক'রে রুপো কাকার কথা মনে পড়ে।

## অক্ষয়কুমার বড়াল

জন্ম ১৮৬০ ; মৃত্যু ১৯১৯, ১৯শে জুন। নিবাস— চোরবাগান, কলিকাতা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু আজীবন লেখাপড়ায় অনুরাগ ছিল। পঠদ্দশায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'শিষ্যত্ব' গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতারচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "পুনর্মিলনে" নামক কবিতাটি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পরে সেকালের বিখ্যাত প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে ; ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি', 'প্রদীপ', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে। "মধ্যাহ্নে" কবিতাটি 'শঙ্খ' হইতে সংকলিত।

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৭১, ৭ই আগস্ট ; মৃত্যু ১৯৫১, ৫ই ডিসেম্বর। নিবাস— জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথের সহোদর। বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। ছবি আঁকিতে ও নানাবিধ হাতের কাজ করিতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল। পরে সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন এবং আজীবন শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি পৃথিবীখ্যাত, কথাশিল্পী হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপতরীর দেশ', 'নালক', 'পথে-বিপথে', 'বুড়ো আংলা', 'আপন কথা' প্রভৃতি পুস্তক তাহার প্রমাণ। শিল্পবিষয়ে তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত বই আছে, যথা, 'ভারতশিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', 'ভারতশিল্পে মূর্তি' প্রভৃতি। "ভাগ্যবিচার" গল্পটি 'রাজকাহিনী' হইতে গৃহীত।

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ১৮২০, ২৬শে সেপ্টেম্বর ; মৃত্যু ১৮৯১, ২৯শে জুলাই। নিবাস— বীরসিংহ, মেদিনীপুর। নয় বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার সংস্কৃত

কলেজে ভর্তি হন ও পাঠ সমাপ্ত করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে ও সমাজসংস্কারে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। শিক্ষাবিষয়ে সংস্কৃতশিক্ষার সংস্কার, বাংলাশিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার পত্তন ও প্রসার তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউশন ( বর্তমান 'বিদ্যাসাগর কলেজ' ) তাঁহারই স্থাপিত। সমাজ সংস্কারে, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে ও বহুবিবাহ-নিবারণে তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" তাঁহার 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন করিয়াছে। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ে তাঁহার রচনা সমাজে ও সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সংকলিত রচনাটি 'শকুন্তলা' ( ১৮৫৪ ) হইতে গৃহীত।

## এস্. ওয়াজেদ আলি

জন্ম ১৮৯০ ; মৃত্যু ১৯৫১। পিতৃনিবাস ও জন্মস্থান— তাজপুর, হুগলি। আলি সাহেব আলিগড় হইতে বি.এ. পাস করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড্ যাত্রা করেন। সেখানে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর ব্যারিস্টারি পাস করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ব্যারিস্টারি তাঁহার ভালো না লাগায় ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া দিয়া ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। যৌবনকাল হইতেই আলি সাহেব বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতেন। শেষের কয়বৎসর অনন্যচিত্ত হইয়া সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। রচিত পুস্তক—'গুলদস্তা', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোয়া' ইত্যাদি। "ভারতবর্ষ" নিবন্ধটি তাঁহার 'মাশুকের দরবার' হইতে গৃহীত।

## করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৭, ১৯শে নবেম্বর ; মৃত্যু ১৯৫৫, ৫ই ফেব্রুয়ারি। নিবাস— শান্তিপুর, নদীয়া। তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়া ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন এবং ১৯০২খ্রীস্টাব্দে চাকরি-জীবন আরম্ভ করেন। গোড়ায় বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহেরপরিদর্শক-রূপে কাজ করিয়া ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এগারো বৎসর বয়সে পঞ্চকোটে পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে তাঁহার কবিজীবনের উন্মেষ হয় এবং আমৃত্যুকাল অব্যাহত থাকে। ১৩০৮বঙ্গাব্দে দেশপ্রেমমূলক কবিতা-সংগ্রহ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশ করিয়া তিনি গ্রন্থকার হন। পরে 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধান-দূর্বা', 'শতনরী', 'রবীন্দ্র-আরতি' ও 'গীতা-রঞ্জন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক" দিয়া সম্মানিত করেন। "জীবন-ভিক্ষা" কবিতাটি তাঁহার 'ধান-দূর্বা' (১৯২১) কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত।

## কাজী নজরুল ইস্‌লাম

জন্ম ১৮৯৯, ২৪শে মে। নিবাস— চুরুলিয়া, বর্ধমান। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্‌টনে যোগ-দান করিয়াছিলেন এবং হাবিলদার হইয়া যুদ্ধ শেষ হইলে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধযাত্রার পরিবেশে কাব্য স্ফূর্তিলাভ করে এবং তাঁহার অদম্য প্রাণশক্তির বলে কাব্যধারা বন্যার আকার ধারণ করে। 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় সেগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়িয়া যায় এবং অত্যল্পকাল-মধ্যে তিনি যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার রচনা, প্রধানতঃ কবিতা, অফুরন্তভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পর পর পুস্তকাকারে বাহির হয়। প্রথম যৌবনে "বিদ্রোহী" কবিতা লিখিয়া তিনি "বিদ্রোহী কবি" নামেই পরিচিত হইয়া পড়েন। সংগীতরচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। গত কয়েক বৎসর কঠিন ব্যাধিতে তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'দোলন-

চাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'ছায়ানট', 'সন্ধ্যা', 'নজরুল-গীতিকা', 'সর্বহারা'— তাঁহার বহু বইয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটি। সংকলিত রচনাটি একটি বিখ্যাত গান, তাঁহার 'সর্বহারা'য় ( ১৯২৬ ) প্রথম প্রকাশিত হয়।

## কামিনী রায়

জন্ম ১৮৬৪, ১২ই অক্টোবর; মৃত্যু ১৯৩৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর। নিবাস— বাসণ্ডা, বরিশাল। মাত্র আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "সুখ" নামক কবিতাটি এন্ট্রান্স পাস করিবার পূর্বেই রচিত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হন। তখন হইতে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত বিবাহ পর্যন্ত, আট বৎসরের মধ্যেই, তাঁহার কাব্য-জীবনের বিশেষ স্ফূর্তি। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলি এই সময়ে প্রকাশিত। 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'গুঞ্জন', 'অশোক-সংগীত', 'দীপ ও ধূপ,' 'জীবনপথে' বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান। "মা আমার" কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' ( ১৮৮৯ ) হইতে গৃহীত।

## শ্রীকালিদাস রায়

জন্ম ১৮৮৯, ৯ই জুলাই। নিবাস— কড়ুই, বর্ধমান। ইনি বাল্যকাল হইতেই কাব্যসাধনা করিতেছেন, অল্প বয়সেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। বি. এ. পাস করিয়া শিক্ষকতা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং বরাবর কাব্যচর্চা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়। ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত 'কুন্দ' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। 'কিসলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'রসকদম্ব', 'ঋতুমঙ্গল', 'লাজাঞ্জলি', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'হৈমন্তী', 'চিত্তচিতা', 'বৈকালী', 'গাথাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি' প্রভৃতি অনেক কাব্যগ্রন্থ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। 'আহরণ' ও 'আহরণী' ইঁহার নির্বাচিত কবিতার চয়নিকা। 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়', 'শরৎসাহিত্য' ও 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' ইঁহার রচিত সমালোচন-সাহিত্যের পুস্তক। "ত্রিরত্ন" কবিতাটি তাঁহার 'আহরণ' নামক সংকলন-গ্রন্থ হইতে গৃহীত। সংকলিত কবিতাটির কিছু কিছু অংশ কবি স্বয়ং পরিবর্তন করিয়াছেন।

## শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জন্ম ১৮৮৩, ১লা (২রা ?) মার্চ। নিবাস— শ্রীখণ্ড, অধুনা কোগ্রাম, (নূতন হাট পোঃ), বর্ধমান। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র-স্বর্ণপদক" প্রাপ্ত হন। কিশোর বয়স হইতেই তিনি কবি। কিন্তু তাঁহার নিজের কথায়—"প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতাই প্রথম আমার চক্ষে কবিতার রূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।" তিনি বিশেষভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকজীবন অবলম্বন করেন। কিশোরকাল হইতে আজ পর্যন্ত অজস্র কবিতা লিখিয়াছেন এবং এখনও লেখার বিরাম নাই। প্রথম কবিতাপুস্তক 'শতদল' ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে 'বনতুলসী', 'উজানি', 'একতারা', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'নূপুর', 'তূণীর', 'রজনীগন্ধা', 'অজয়' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'স্বর্ণসন্ধ্যা' ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। "ছোটোর দাবি", কবিতাটি কবির 'অজয়' নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত।

## চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম ১৮৮৩, ২৯শে জুন ; মৃত্যু ২৬ আগস্ট ১৯৬১। জন্মস্থান ও পিতৃনিবাস—হরিনাভি, চব্বিশ পরগনা। ইনি কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান 'বিদ্যাসাগর কলেজ') ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর, ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি বিশ্বভারতী ও অন্যান্য বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞানের সাধনায় রত থাকিয়াও ইনি পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রাঞ্জল ও সরস রচনা-ভঙ্গীর জন্য ইঁহার রচিত নিবন্ধগুলি পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমাদরলাভ করিয়াছে। রচিত গ্রন্থ— 'নব্যবিজ্ঞান', 'বাঙালীর খাদ্য', 'আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু', 'বিশ্বের উপাদান', 'ব্যাধির পরাজয়', 'পদার্থ-বিদ্যার নবযুগ', 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী' ইত্যাদি। এই সংকলনের "লুই পাস্তুর" নিবন্ধটি 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী' হইতে গৃহীত।

## জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ১৮৫৮, ৩০শে নবেম্বর ; মৃত্যু ১৯৩৭, ২৩শে নবেম্বর। নিবাস—রাড়িখাল, ঢাকা-বিক্রমপুর। স্বদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্‌সি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি অনেক নূতন আবিষ্কারের গৌরব লাভ করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও তাঁহাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকার করেন। কলিকাতার "বসু-বিজ্ঞানমন্দির" তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। বিজ্ঞানবিষয়ে সাহিত্য-রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহার "অব্যক্ত" ( ১৯২১ ) বইখানিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান সংকলনের রচনাটি 'অব্যক্ত' হইতে গৃহীত।

## দীনেশচন্দ্র সেন

জন্ম ১৮৬৬, ৩রা নবেম্বর ; মৃত্যু ১৯৩৯, ২০শে নবেম্বর। নিবাস—সুয়াপুর, ঢাকা। বাল্যকাল হইতেই দীনেশচন্দ্র সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন এবং ছাত্রজীবনেই নানাভাবে পুরস্কৃত হন কুমিল্লার শম্ভুনাথ স্কুলে প্রধানশিক্ষকরূপে কাজ করিবার সময় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন-সংগ্রহে বাংলাদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অনেক পুরাতন পুঁথি-আবিষ্কারে সমর্থ হন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার প্রধান কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই সাহিত্যশিল্পী হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 'রামায়ণী কথা', 'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা', 'জড়ভরত', 'বৃহৎ বঙ্গ', 'বাংলার পুরনারী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগে বহু বৎসর 'রামতনু লাহিড়ী'-অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দীনেশচন্দ্র বহু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের লৌকিক গীতিকাব্যগুলি তাঁহারই যত্নে

প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্. উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। "ভরত" রচনাটি 'রামায়ণী কথা' ( ১৯০৪ ) হইতে গৃহীত।

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১৮৬৩, ১৯শে জুলাই ; মৃত্যু ১৯১৩, ১৭ই মে। নিবাস— কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম্. এ. পাস করিয়া স্টেট স্কলার্‌শিপ লইয়া বিলাত যান এবং ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি-পদে বাহাল হন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত "শ্মশান-সঙ্গীত" তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। বিলাতে অবস্থান-কালে ইংরেজিতে কবিতা লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ কবি হইলেও নাট্যকাররূপেই তাঁহার সমধিক খ্যাতি। তাঁহার গান, বিশেষ করিয়া হাসির গান, বাংলাসাহিত্যের সম্পদ। 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' 'গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার রচিত। "নন্দলাল" কবিতাটি 'হাসির গান' হইতে সংকলিত।

## নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম ১৮৪৭, ১০ই ফেব্রুয়ারি ; মৃত্যু ১৯০৯, ২৩শে জানুয়ারি। নিবাস— নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক এবং পরে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ৩৬ বৎসর এই কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে তাঁহার "কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সারাজীবন তিনি সাহিত্যচর্চা করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ কবি হইলেও গদ্যরচনাতেও তাঁহার হাত ছিল, তাঁহার আত্মচরিত 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অবকাশ-রঞ্জিনী', 'পলাশির যুদ্ধ', 'রঙ্গমতী', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' সমধিক প্রসিদ্ধ। "আশা" রচনাংশটি 'পলাশির যুদ্ধ' ( ১৮৭৫ ) হইতে উৎকলিত।

## প্রমথ চৌধুরী

জন্ম ১৮৬৮, ৭ই আগস্ট ; মৃত্যু ১৯৪৬, ২রা সেপ্টেম্বর। পিতৃনিবাস—হরিপুর, পাবনা। হরিপুরের চৌধুরী-জমিদার-বংশে জন্ম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় দর্শন-শাস্ত্রের অনার্সে ও এম্. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী-সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি বেশিদিন ব্যারিস্টারি করেন নাই। দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির রিসিভারের পদে বহুদিন কর্ম করিবার পর, শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কলেজের অধ্যাপক হন। তিনি 'সবুজপত্র' নামে মাসিক সাহিত্যপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যে অভিনব রচনাভঙ্গী প্রবর্তন এবং সাহিত্যোপযোগী 'মৌখিক' ভাষা প্রচলিত করেন। তাঁহার ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল'। ইনি একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, সমালোচক ও কথাসাহিত্যিক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ—'বীরবলের হালখাতা', 'চার-ইয়ারী কথা', 'সনেট-পঞ্চাশৎ', 'নীললোহিত', 'রায়তের কথা', 'গল্পসংগ্রহ' ইত্যাদি। কিছু কাল হইল, তাঁহার প্রবন্ধসমূহের সংকলন দুই খণ্ডে 'প্রবন্ধসংগ্রহ' নামে ছাপা হইয়াছে। "মন্ত্রশক্তি" গল্পটি 'ছোটোদের বার্ষিকী' হইতে গৃহীত।

## প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

জন্ম ১৮৭২ ; মৃত্যু ১৯৪৯। ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের বিখ্যাত জমিদারবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি ছিলেন সন্তোষের জমিদার মহারাজ মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কৈশোরকাল হইতেই প্রমথনাথ কবিতা-রচনার অনুশীলন করিতেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পদ্মা', 'গৌরাঙ্গ', 'গৈরিক', 'পাথার', 'পাষাণ' ইত্যাদি সুপরিচিত। শেষজীবনে তিনি স্বরচিত কবিতাগুলি কাব্যগ্রন্থাবলীর তিন খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত করেন। তিনি বহু গান রচনা করিয়াছিলেন ; তাঁহার কাব্য-গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে গানগুলি স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইঁহার রচিত কয়েকখানি নাটকও আছে। এই সংকলনে প্রকাশিত "বাঙালীর মা" কবিতাটি কবির 'পাষাণ' কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত।

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৩৮, ২৬শে জুন; মৃত্যু ১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল। নিবাস—কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ-পরগনা। তাঁহার ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুইজন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে একজন। পরীক্ষাপাসের সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে সরকারী চাকুরিতে বাহাল হন এবং বরাবর যোগ্যতার সহিত সেই কাজ করিয়া যান। হুগলি কলেজে ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর'এ তাঁহার বহু গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও তিনি পর পর অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-রূপে গণ্য হন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্র বাংলাসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। সাহিত্যের বহু ব্যাপারে তিনি প্রথম পথিপ্রদর্শক।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পর 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী', 'সীতারাম' প্রভৃতি একে একে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধসাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনায় বিষয়বস্তু ও শিল্পকলার অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়। ভাষায় সাধু রীতি ও চল্‌তি রীতির সমন্বয়সাধন করিয়া তিনি বাংলা গদ্যরচনার ভঙ্গীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া তুলেন। এই পুস্তকে "সাগরসঙ্গমে নবকুমার" এই অংশটি 'কপালকুণ্ডলা' হইতে এবং "বসন্তের কোকিল" 'কমলাকান্তের দপ্তর' হইতে সংকলিত।

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৯৪, ১২ই সেপ্টেম্বর; মৃত্যু ১৯৫০, ১লা নবেম্বর। পিতৃনিবাস

—বারাকপুর, বনগ্রাম মহকুমা, চব্বিশ-পরগনা ; জন্মস্থান— মাতুলালয়, মুরাতিপুর, চব্বিশ-পরগনা। বিভূতিভূষণ দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাল্য-জীবনে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ; এই দারিদ্র্যই তাঁহার অনন্যসাধারণ শিল্পীচরিত্র গঠন করিয়াছিল। পরের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন, পরে রিপন কলেজ হইতে আই. এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল শিক্ষকতা করিবার পর তিনি ভাগলপুরে একটি জমিদারী এস্টেটে চাকরি পাইয়া বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই ভাগলপুরেই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। সেখান হইতে আসিয়া তিনি আবার শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে শিক্ষকতা ছাড়িয়া দেন ; বৎসরের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় থাকিতেন।

বঙ্গসাহিত্যে বিভূতিভূষণের স্থান অনন্যসাধারণ এবং মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। তিনি বহু ছোটোগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, দিনলিপি ও কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থগুলির নাম— 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'অনুবর্তন', 'অভিযাত্রিক', 'দেবযান', 'ইছামতী', 'আদর্শ হিন্দুহোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'মেঘ-মল্লার', 'কিন্নরদল', 'যাত্রাবদল', 'নবাগত', 'অসাধারণ', 'মৌরীফুল', 'মুখোস ও মুখশ্রী', 'ক্ষণভঙ্গুর', 'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও' ; 'উৎকর্ণ', 'উপলখণ্ড', 'তৃণাঙ্কুর', 'উর্মিমুখর', 'বিচিত্র জগৎ', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'চাঁদের পাহাড়', 'হীরামাণিক জ্বলে' ইত্যাদি। 'ইছামতী' উপন্যাসখানি বিভূতিভূষণের পরলোকগমনের পর 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করে। তাঁহার 'অসাধারণ' গল্পগ্রন্থ হইতে "রুপো কাকা" গল্পটি এই পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে।

## মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম ১৮২৪, ২৫শে জানুয়ারি ; মৃত্যু ১৮৭৩, ২৯শে জুন। নিবাস—সাগরদাঁড়ি, যশোহর। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন নাম লইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতেই কাব্যরচনা শুরু করেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজপ্রবাস

হইতে ফিরিয়া বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় ( ৩১শে জুলাই ১৮৫৮ ) দেখিয়া তিনি মাতৃভাষায় নাটক-রচনার সংকল্প করেন। ফলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের মতো আধুনিকশিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাশালী কবির হাতে বাংলাসাহিত্যের অনেক নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যরীতি-সংগত নাটক ও প্রহসন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, চতুর্দশপদী কবিতা এবং বিশেষ এক গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি বাংলাদেশে অমর হইয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু বাংলা কাব্য নয়, বাংলা গদ্যকেও শক্তিশালী করিয়াছে। তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অসাধারণ সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। "আত্মবিলাপ" কবিতাটি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে রচিত ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। "কাশীরাম দাস" কবিতাটি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ( ১৮৬৬ ) হইতে গৃহীত। "কবিগুরু-বন্দনা" 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ হইতে সংকলিত।

## মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ১৮৮৮, ২৬শে অক্টোবর; মৃত্যু ১৯৫২, ২৬শে জুলাই। পিতৃনিবাস —বলাগড়, হুগলি; জন্মস্থান—মাতুলালয়, কাঁচড়াপাড়া, চব্বিশ-পরগনা। মোহিতলাল কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন ( মজুমদার ) মহাশয়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র। বাল্যকালে হালিশহরে, কৈশোর-যৌবনে কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৯০৮ সালে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পাস করার পর কলিকাতার দু-একটি বিদ্যালয়ে অনেক দিন শিক্ষকতা করেন; পরে শেষযৌবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। এই পদে তিনি বহুবৎসর অসামান্য যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। অবসর গ্রহণের পর জীবনের শেষ দশ বৎসর অনন্যমনা হইয়া সাহিত্যসেবা করেন। কবি ও সাহিত্যসমালোচক হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ

প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ—'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'। রচিত সনেটগুলি চয়ন করিয়া 'ছন্দচতুর্দশী' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ— 'সাহিত্য-বিতান', 'আধুনিক সাহিত্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য' ইত্যাদি। "কালবৈশাখী" কবিতাটি 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্য হইতে সংকলিত।

## যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম ১৮৮৭, ২৬শে জুন; মৃত্যু ১৯৫৪, ১৭ই সেপ্টেম্বর। পিতৃনিবাস—শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর। জন্মস্থান— মাতুলালয়, পাতিলপাড়া, বর্ধমান। যতীন্দ্রনাথ এফ. এ. পাস করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৯১১ সালে বি. ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি নদীয়া জেলাবোর্ডের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি কাসিমবাজার রাজ-এস্টেটের ইঞ্জিনিয়ার হন। অবসর গ্রহণের পর তিনি অল্পদিনই জীবিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের রচনা, ভাব ভাষা দৃষ্টিভঙ্গী ও আলংকারিক চাতুর্যের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য -হেতু অসাধারণ। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' ও 'অনুপূর্বা' (সংকলনগ্রন্থ)। কাব্যরসবিচারের পুস্তক—'কাব্যপরিমিতি'। অনূদিত কাব্য—'কুমারসম্ভব'। অনূদিত নাট্য—'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো' ও 'হ্যামলেট'। "হাট" কবিতাটি 'মরীচিকা' হইতে সংকলিত।

## যতীন্দ্রমোহন বাগচী

জন্ম ১৮৭৮, ২৭শে নবেম্বর; মৃত্যু ১৯৪৮, ১লা ফেব্রুয়ারি। নিবাস—জমসেরপুর, নদীয়া। জমসেরপুরের বিখ্যাত জমিদারবংশে ইঁহার জন্ম। অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিয়া ও 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাণীর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'রেখা', 'লেখা', 'নাগকেশর', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'মহাভারতী', 'পাঞ্চজন্য' উল্লেখযোগ্য। "জন্মভূমি" কবিতাটি তাঁহার 'রেখা' ( ১৯১০ ) হইতে সংকলিত।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৮৬১, ৭ই মে; মৃত্যু ১৯৪১, ৭ই আগস্ট। নিবাস—জোড়াসাঁকো, কলিকাতা; পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, পৃথিবীর সকল কালের কবিসমাজে অন্যতম প্রধান কবি। গীতিকবিতায় অদ্বিতীয়। শিশুকাল হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কৈশোর অতিক্রান্ত না হইতেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ( ১৮৮২ ) প্রকাশিত হইবার পর, এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা পরাইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন। সাহিত্যের সর্ববিভাগে তাঁহার দান বিপুল। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম-বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্দ ছন্দ ও ভাষা -তত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য-কবিতা, রূপকথা, রূপক-নাট্য, প্রহসন— একজনের হাতে বাংলা গদ্য-সাহিত্য এমন নানা ভাবে আর কখনো পুষ্ট হয় নাই। কবিতায় ও গানে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে তিনি একা সহস্রবর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। তিনি তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন। নাইট উপাধিতে ভূষিত হইবার পরে, জালিয়ানওয়ালাবাগ-অত্যাচারের প্রতিবাদে তাহা বর্জন করিয়া তিনি দেশবাসীর আরও প্রিয় হইয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁহার অসামান্য কীর্তি। মৃত্যুর চারি মাস পূর্বে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে পঠিত, তাঁহার "সভ্যতার সংকট" ভাষণ ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সত্যপথের ইঙ্গিত দিয়াছে। নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনাবলী সংকলিত হইয়াছে— 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) হইতে "ভারততীর্থ" ও "ধুলামন্দির"; 'কথা' ( ১৯০০ ) হইতে "প্রতিনিধি"; 'চৈতালি'

( কাব্যগ্রন্থাবলী ; ১৮৯৬ ) হইতে "প্রাচীন ভারত" ; 'নৈবেদ্য' (১৯০১) হইতে "প্রার্থনা" ; দ্বিতীয়-সংস্করণ 'পুনশ্চ' ( ১৯৩৪ ) হইতে "শুচি" ; 'জীবনস্মৃতি' ( ১৯১২ ) হইতে "স্বাদেশিকতা" ; 'আটটি গল্প' ( ১৯১১ ) হইতে "সাক্ষী" এবং 'লিপিকা' ( ১৯২২ ) হইতে "তোতা-কাহিনী"।

## রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৪৫, ৩১শে অক্টোবর ; মৃত্যু ১৮৮৬, ১০ই অক্টোবর। নিবাস ও জন্মস্থান— নদীয়া জেলার গোসাঁই-দুর্গাপুর গ্রাম। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। এম্. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি ওকালতি পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। শিক্ষাসমাপ্তির পর ইনি শিক্ষাবিভাগে কর্মে ব্রতী হন ; জেনারেল এসেম্ব্লিজ, প্রেসিডেন্সি, কটক রাভেন্‌শ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ ইত্যাদি কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। অবশেষে ইনি বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদ লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত চিন্তাশীল প্রবন্ধকার ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ইঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি 'প্রবন্ধমালা'-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন ঐতিহাসিক ছিলেন— ইঁহার রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ইঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার সাক্ষ্যদান করে। ইনি কবিও ছিলেন— 'মিত্রবিলাপ' ইঁহার বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ। এই সংকলনে প্রকাশিত "প্রতিভা" প্রবন্ধটি তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ'-নামক পুস্তক হইতে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত।

## রাজশেখর বসু

জন্ম ১৮৮০, ১৬ই মার্চ ; মৃত্যু ১৯৬০, ২৭শে এপ্রিল। পিতৃনিবাস— উলা বীরনগর, নদীয়া। জন্মস্থান— মাতুলালয়, বামুনপাড়া, বর্ধমান। পিতা চন্দ্রশেখর বসু একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। রাজশেখরের বাল্যকৈশোরের শিক্ষা বিহার অঞ্চলে সমাপ্ত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ

করেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রাজশেখরবাবু রসায়নশাস্ত্রে এম্. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পর বি. এল. পরীক্ষাও পাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ওকালতি না করিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'এ যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃত্ব লাভ করিয়া ইহাকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলেন। ছাত্রজীবন হইতেই বসু মহাশয় সাহিত্যচর্চা করিতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবিধ শাখাতে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান আছে। পরিহাসরসের কথাসাহিত্যিক রূপেই তিনি অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রচিত 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প', 'গল্পকল্প' 'ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প' এবং স্বনামে রচিত 'চলন্তিকা' (অভিধান), 'লঘুগুরু', 'কুটিরশিল্প', 'ভারতের খনিজ', 'কালিদাসের মেঘদূত' ( মূল অনুবাদ এবং অন্বয়-সহ ব্যাখ্যা ও টীকা ), 'বাল্মীকি-রামায়ণ' ( সারানুবাদ ), 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত' ( সারানুবাদ ), 'হিতোপদেশের গল্প' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁহার কীর্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে জগত্তারিণী পদক ও ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে সরোজিনী পদক দিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহার 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার দান করেন। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার 'আনন্দীবাঈ' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদমীর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধি দেন। "কৌরবসভায় কৃষ্ণ" নিবন্ধটি তাঁহার অনূদিত মহাভারত হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থে সংকলিত।

## রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম ১৮৬৪, ২০শে আগস্ট ; মৃত্যু ১৯১৯, ৬ই জুন। নিবাস—টেঞাবৈদ্যপুর, মুর্শিদাবাদ। রামেন্দ্রসুন্দর মেধাবী ছাত্র ছিলেন ; তিনি

এম্. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ( পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে ) প্রথম স্থান অধিকার করেন ও কলিকাতা রিপন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়া, পরে অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। স্কুলে পড়িবার সময় কবিতা লিখিয়া তাঁহার সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। পরে বাংলাসাহিত্যের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। বি. এ. পড়িবার সময় তাঁহার প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তদবধি দুরূহ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়ে তিনি বহু সরস প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিতে থাকেন। বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ে তাঁহার তুল্য লেখক বাংলাদেশে আর নাই। তাঁহার রচিত 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম-কথা', 'চরিত-কথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দ-কথা', 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞ-কথা', 'নানা কথা', 'জগৎ-কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। তাঁহার হাতে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নবজীবন লাভ করিয়াছিল। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটি 'চরিত-কথা' হইতে গৃহীত।

## শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর; মৃত্যু ১৯৩৮, ১৬ই জানুয়ারি। নিবাস—দেবানন্দপুর, হুগলি। বাল্যে দেবানন্দপুরেই গল্প-রচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি। পরে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে সাহিত্য-সাধনা বিশেষ অগ্রসর হয়। কিন্তু সত্যকার সাহিত্যজীবনের আরম্ভ বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে, ব্রহ্মপ্রবাসে। গল্প ও উপন্যাস -রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি লোকমুখে কথাসাহিত্য-সম্রাট্ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। প্রথম-মুদ্রিত রচনা 'কুন্তলীন-পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" গল্প। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "বড়দিদি" গল্পের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তক। পরে 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লী-সমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত' ( ১-৪ পর্ব ), 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা', 'হরিলক্ষ্মী', 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন',

'বিপ্রদাস' প্রভৃতি তাঁহার অনেক গল্প-উপন্যাস বাহির হইয়াছে। অল্প-কালের মধ্যে তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয়তা আর কোনো লেখক লাভ করেন নাই। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের একটি অংশ "নতুন-দা" নামে এই পুস্তকে সংকলিত।

## শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম ১৮৪৭, ৩১শে জানুয়ারি ; মৃত্যু ১৯১৯, ২৩শে সেপ্টেম্বর। জন্মস্থান —মাতুলালয়, চাংড়িপোতা, চব্বিশ-পরগনা ; পিতৃভবন— মজিলপুর, চব্বিশ-পরগনা। শিবনাথের পিতৃকুল ওমাতৃকুল দুইই ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশ। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে শিবনাথ সংস্কৃতে এম.এ.পাস করিয়া শাস্ত্রী উপাধি পান। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এফ এ. পাস করার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে ব্রাহ্মসমাজে আচার্যপদ লাভ করেন। ছাত্রজীবন হইতেই শিবনাথ সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। তাঁহার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক। শিবনাথের সাহিত্যসেবায় হাতে-খড়ি হয় এই পত্রেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে শিবনাথের দান অমূল্য। তাঁহার প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল দেশের ধর্ম সমাজ ও নৈতিকজীবনের সংস্কারসাধন। শিবনাথের রচিত 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ দুইখানি উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাসে অসামান্য অবদান। ইনি কবিও ছিলেন ; রচিত কবিতাগ্রন্থ—'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রি-কুসুম', 'ছায়াময়ীপরিণয়' ও 'নির্বাসিতের বিলাপ'। তিনি 'মেজবউ', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে', 'যুগান্তর' ইত্যাদি কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করেন। তাঁহার প্রবন্ধপুস্তক—'প্রবন্ধাবলি', 'প্রবন্ধমালা', 'ধর্মজীবন', 'গৃহধর্ম'। শিবনাথ হরিনাভি স্কুলে এবং ভবানীপুর সাউথ সাবার্বন স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি 'সমদর্শী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই সংকলনে "মহাত্মা রামমোহন" প্রবন্ধটি তাঁহার 'প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ( ১৯০৪ ) হইতে গৃহীত।

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম ১৮৮২, ১২ই ফেব্রুয়ারি ; মৃত্যু ১৯২২, ২৫শে জুন। নিবাস—চুপী, বর্ধমান; পরে দর্জিপাড়া, কলিকাতা। খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র; কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন; সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল অপরিসীম। ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুখী' (অনূদিত উপন্যাস) 'চীনের ধূপ' (নিবন্ধ), 'রঙ্গমল্লী' (কবিতায় ও গদ্যে অনূদিত নাটকাবলী) ও 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ছাড়া তাঁহার রচিত বাকি পনেরোখানি গ্রন্থই কাব্য। সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষের উপর তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন ; বহু কবিতা এখনও সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠাতেই আছে। ছন্দে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল, ছন্দোজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণ "ছন্দ-সরস্বতী" ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৫) প্রবন্ধেও পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পরে 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩০) 'ডঙ্কানিশান'-নামক অসম্পূর্ণ রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সম্পূর্ণ হইলে···বাঙ্গালা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইত।" উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণি-মঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা' 'বেলাশেষের গান', 'বিদায়-আরতি'। "আমরা" কবিতাটি 'কুহু ও কেকা'য় (১৯২২) আছে।

## হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জন্ম ১৮৫৩, ৬ই ডিসেম্বর ; মৃত্যু ১৯৩১, ১৭ই নবেম্বর। নিবাস—নৈহাটি, চব্বিশ-পরগনা। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরে উহার অধ্যক্ষ-পদ লাভ করেন। তিনি যৌবনকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রে লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার ভাষা অতিশয় সরস ; পণ্ডিত হইলেও ভাষার সরলতা রক্ষায় ইনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে ইঁহার গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী বাংলাসাহিত্যের

সম্পদ। অতি দুরূহ কঠিন বিষয়েও ইনি সরস প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। তিন বৎসর কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি.লিট্ উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু প্রাচীন মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া উভয় প্রতিষ্ঠানকেই গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' তাঁহারই আবিষ্কার। তাঁহার উল্লেখযোগ্য বাংলা বই 'ভারতমহিলা', 'বাল্মীকির জয়', 'মেঘদূত-ব্যাখ্যা', 'কাঞ্চনমালা', 'বেণের মেয়ে', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম'। বর্তমান গ্রন্থে 'বেণের মেয়ে' গল্পের কিয়দংশ "সমুদ্রপথে" নামে সংকলিত হইয়াছে।

## হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৩৮, ১৭ই এপ্রিল; মৃত্যু ১৯০৩, ২৪শে মে। জন্মস্থান— হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুলিটা গ্রাম। তিনি হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম যৌবনে তিনি শিক্ষকতা করেন। তার পর বি. এল্. পাস করিয়া এক বৎসর মুন্সেফি করেন। মুন্সেফি ছাড়িয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। ওকালতিতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হন। তখন তাঁহার খুবই অর্থকষ্ট হইয়াছিল। কবি ত্রিশ টাকা করিয়া সরকারী বৃত্তি পাইতেন, দেশের কোনো কোনো বদান্য ব্যক্তিও মাসিক সাহায্য করিতেন। কবির প্রথম গ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী'; পরে তিনি ক্রমে ক্রমে 'বৃত্রসংহার', 'ছায়াময়ী', 'আশাকানন', 'কবিতাবলী' ও 'দশমহাবিদ্যা' রচনা করেন। 'বৃত্রসংহার'ই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেলের পর হেমচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। "দধীচির তনুত্যাগ" 'বৃত্রসংহার' হইতে সংকলিত।

—